সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন • জানুয়ারি-মার্চ ২০২৩

# শিক্ষালোক

কোনো গাঁয়ে কোনো ঘর কেউ রবে না নিরক্ষর

## প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক

# মরহুম মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার ম্যুরাল উদ্বোধন

২২ জানুয়ারি ২০২৩এ সকাল ১১টায় সিদীপের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক মরহুম মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার একটি দেয়ালচিত্র উদ্বোধন করা হয় সিদীপ ভবনের নিচতলায়। সিদীপ ভবনের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর উপস্থিতিতে ম্যুরালটি উদ্বোধন করেন মরহুম মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার সহধর্মিণী জনাব নাঈমা খাতুন, সিদীপ পরিচালনা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব শাহজাহান ভুঁইয়া এবং সিদীপ পরিচালনা পরিষদের সদস্য জনাব মাসুদা বানু ফারুক রত্না। ম্যুরালটি নির্মাণ করেন শিল্পী রুপাই সোহাগ। এই নির্মাণ কর্মে ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিল গণযোগাযোগ সংস্থা আইআরসি। 'কোনো গাঁয়ে কোনো ঘর কেউ রবে না নিরক্ষর' এই অভূতপূর্ব বোধ থেকেই মোহাম্মদ ইয়াহিয়া বাংলাদেশের শিশুশিক্ষায় যোগ করেছেন এক অভিনব অধ্যায়। স্বাগত বক্তব্যে সিদীপের নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদা শৈল্পিক সুষমামণ্ডিত ম্যুরালটি নির্মাণের জন্য আইআরসি-র কর্ণধার জাহিদুল ইসলামকে ধন্যবাদ জানান।

সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন
ইমেইল: shikkhalokcdip@gmail.com, ফেসবুক: শিক্ষালোক বুলেটিন

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মোহাম্মদ ইয়াহিয়া

# শিক্ষালোক

জানুয়ারি - মার্চ ২০২৩ ● ১০ম বর্ষ ১ম সংখ্যা

## সূচি

ভাষার লড়াই : ইতিহাসের আলোকে - আলমগীর খান ২
জয় হোক পাঠাগারের - আবদুস ছাত্তার খান ৪
পাবনার কাশীনাথপুরে শিক্ষার্থীদের জন্য চন্দ্রবিন্দুর আয়োজন ৫
পাঠাগার সম্মেলন ২০২২-এর সফল আয়োজন ৬
পার্বত্য জেলার দর্শনীয় স্থানে ভ্রমণ - ড. আশরাফ পিন্টু ৮
শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন ১১
সিদীপ প্রধান কার্যালয়ে পিঠা উৎসব ১২
মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার ১৩
গল্প : আশা - ফজলুল বারি ১৫
সরাইল অন্নদা উচ্চ বিদ্যালয়ের কথা - জুয়েল ঠাকুর ১৭
রাখি খাতুনের সফলতার গল্প - মো. জাহিদ হাসান ১৮
মালেকা বেগমের ঘুরে দাঁড়ানো - কিশোর কুমার ১৯
বায়ুমানের উপর কোভিড-১৯এর প্রভাব - মাহবুবুর রশীদ অরিস ২১
নৈতিক চেতনা জাগ্রত হোক - মাহ্‌ফুজ সালাম ২২
সভ্যতা, শিক্ষা ও নৈতিকতা - মো. মাহবুব হোসেন ২৩
বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু ও বেগম রোকেয়ার জন্মবার্ষিকী ২৫
আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন ২৬
বই-আলোচনা : আলো ছায়ার খেলা - মোহাম্মদ মাহবুব উল আলম ২৭

**প্রধান সম্পাদক**
মিফতা নাঈম হুদা

**সম্পাদক**
ফজলুল বারি

**নির্বাহী সম্পাদক**
আলমগীর খান

**প্রচ্ছদের ছবি**
শিল্পী সামি আজফার

ডিজাইন ও মুদ্রণ
আইআরসি irc.com.bd

# সম্পাদকীয়

চলতি শিক্ষালোক প্রকাশিত হচ্ছে ঐতিহাসিক ভাষার ও স্বাধীনতা দিবসের মাসে। একুশে ফেব্রুয়ারি আজ উদযাপিত হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে। কিন্তু যে ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য আমাদের পূর্বপুরুষেরা জীবনদান করেছেন, যার ঢেউ এসে লেগেছে একাত্তরের তটে এবং একসময় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে যা ছিনিয়ে আনে অমূল্য স্বাধীনতার সূর্য–আমরা কি তাকে প্রাপ্য সম্মান দিচ্ছি? আমাদের দেশে বাংলা ভাষার বর্তমান অবস্থা কি? এ দেশে প্রচলিত অন্য ভাষারাই বা কেমন আছে? এসব বিষয়ে গভীর আলোচনার প্রয়োজন আছে।

আমাদের শিশুকিশোরেরা আজকাল মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেটের ক্ষতিকারক আসক্তির শিকার হচ্ছে। অন্যদিকে পড়ালেখা হয়ে পড়ছে যেন কেবল টেক্সটবইকেন্দ্রিক। ফলে জ্ঞানের আনন্দময় ও বিরাট সৃষ্টিশীল জগৎ থেকে ছেলেমেয়েরা হয়ে পড়ছে বিচ্ছিন্ন। আমাদের সংস্থা নিজ কর্ম-এলাকায় বিভিন্ন স্কুলকলেজে 'মুক্তপাঠাগার' স্থাপনের মাধ্যমে এ অবস্থায় একটি কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ পর্যন্ত আমাদের অভিজ্ঞতা আশা জাগানিয়া।

শিশুকিশোরদের নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও মানবতাবাদী চেতনা বিকাশের জন্য আমাদের সবার সর্বোচ্চ উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

চলতি সংখ্যায় সিদীপের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি এসব বিষয়ের প্রতিফলন উল্লেখযোগ্য। আর তা সময়োপযোগী বলে আমাদের ধারণা।

ফজলুল বারি

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)
বাসা নং-১৭, রোড নং-১৩, পিসিকালচার হাউজিং সোসাইটি লি:, শেখেরটেক, আদাবর, ঢাকা-১২০৭, ফোন: ৪৮১১৮৬৩৩, ৪৮১১৮৬৩৪।
Email : info@cdipbd.org, web: www.cdipbd.org

# ভাষার লড়াই ইতিহাসের আলোকে

আলমগীর খান

১৯৫২ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য ও মূল কথা তো এই–কোনো ভাষার প্রতি বিদ্বেষ নয়, 'সকল ভাষার সমান মর্যাদা'। অথচ দোকানের নামফলকে, উচ্চশিক্ষার বিদ্যালয়ে, আদালত প্রাঙ্গণে, ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনে, পরীক্ষাযুদ্ধে, চাকরির আবেদনে–এ দেশে সর্বত্র একটি ভাষার আধিপত্য, তা হলো ইংরেজি

১৯৫২র ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষার প্রশ্নে রক্তদানের দিনটিকে অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে এ দেশে পালন করা হয়। সর্বোপরি এ ঐতিহাসিক দিনটি বর্তমানে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হয়। কিন্তু দেশের ভিতর এ দেশবাসীর মানুষের মাতৃভাষা বাংলার অবস্থা কি? এ দেশের যে কোনো শহরের রাস্তায় নামলেই দেখা যাবে সাইনবোর্ডে বিভিন্ন দোকানপাট, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের নাম ইংরেজিতে লেখা খুব সুন্দর জ্বলজ্বলে অক্ষরে। আর বাংলায় লেখা বিভিন্ন সাইনবোর্ডে ও নির্দেশিকায় ভুল ব্যাকরণের ও বানানের ছড়াছড়ি।

আবার, আমরা সবাই জানি বাংলাদেশে প্রথম শ্রেণি থেকেই ছেলেমেয়েদের ইংরেজি শিক্ষা দেয়া হয়। বেসরকারি স্কুলগুলোয় প্রাকপ্রাথমিক থেকেই এ উদ্যোগ শুরু হয়। আর ছেলেমেয়ে যতই ওপরের ক্লাসে ওঠে ততই বাড়তে থাকে ইংরেজির গুরুত্ব। ইংরেজিতে পাশ না করে কারো পক্ষে ওপরের ক্লাসে ওঠা সম্ভব না। অথচ সেই ইংরেজি শিক্ষার অবস্থাটা কি? এক কথায়: করুণ।

অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও এস্থার দুফলো তাদের পুওর ইকোনোমিকস বইতে লিখেছেন, "সন্তানকে ইংরেজি ভাষায় শিক্ষাদান দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে বাবামায়ের কাছে বেশ আকর্ষণীয়। কিন্তু অ-ইংরেজিভাষী বাবামায়ের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় যে, শিক্ষক ইংরেজি শেখাতে পারছেন কি না।"

সত্যিটা হচ্ছে, আসলেই তারা পারেন না। স্কুলকলেজ থেকে কেউ ইংরেজি শেখে না, যা শেখে তা পারিবারিকভাবে কিংবা ব্যক্তিগত চেষ্টায়। পারিবারিক সহযোগিতা ছাড়া কিংবা বিশেষক্ষেত্রে খুব ভাল কোনো শিক্ষকের তত্ত্বাবধান ছাড়া আমাদের স্কুলকলেজে যে ইংরেজি শিক্ষা তা খুবই কৃত্রিম, বাস্তবতাবিচ্যুত ও অপ্রয়োজনীয়। সংকটের শিকড় খুঁজতে আমরা একটু পিছনে ফিরে তাকাই।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষার দাবিতে বাঙ্গালি ছাত্রজনতার মহান আত্মত্যাগ ও দুর্বার আন্দোলনের পর ১৯৫৩ সালের মার্চে কবি হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় "একুশে ফেব্রুয়ারী" সংকলনটি প্রকাশিত হয়। এটি একটি ঐতিহাসিক সাহিত্যিক দলিল। এ সংকলনে প্রকাশিত আলী আশরাফের লেখা "সকল ভাষার সমান মর্যাদা" একটি গভীর চেতনাসমৃদ্ধ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রচনা। এ ঐতিহাসিক রচনাটিতে শাসক ও জনগণের ভাষিক দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে লেখক বলেছিলেন:

"তদানীন্তন শাসকচক্র বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা জনগণের ভাষার দাবী মেনে নেয়নি। অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠী জোর করে চাপিয়ে দিল যে, ইংরেজীই হবে একমাত্র 'রাষ্ট্রভাষা'। 'রাষ্ট্রভাষা' কথাটাও স্বৈরাচারী-রাষ্ট্র ব্যবস্থার ফলরূপেই প্রচলিত হয়ে আসছে। অবিভক্ত ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পত্তনের পূর্বে রাষ্ট্রব্যবস্থা যখন ছিল সামন্তযুগীয় রাজতন্ত্র, যখন শাসকগোষ্ঠী দেশের জনসাধারণ থেকে আলাদা ও উচ্চতর জীব হিসেবে একটা বিশেষ মর্যাদা ও অধিকার সম্পন্ন শ্রেণী (Privileged Class) বলে নিজেদের জাহির করতো, তখন রাজদরবারে ব্যবহৃত হত একটি বিশেষ ভাষা (Court Language), যে-ভাষা অধিকাংশ জনসাধারণের ভাষা হত না। যেমন, নবাবী আমলের এক সময়ে বাংলাদেশের রাজদরবারে ব্যবহৃত হত ফার্সী।"

এখনও আমাদের শিক্ষকের ভাষা ছাত্রছাত্রী বোঝে না, বিচারকের ভাষা আসামী বোঝে না ও চিকিৎসকের ভাষা রোগী বোঝে না–কারণ তারা ভিন্ন ভাষায় কথা বলেন। চিকিৎসকেরা ইংরেজিতে পড়ালেখা করেন ও ইংরেজিতে প্রেসক্রিপশন লেখেন, রোগী কিছু জানতে চাইলে দুচারটে ধমকধর্মী ইংরেজি শব্দ প্রয়োগ করে তাকে থামিয়ে দেন। অথচ স্বাধীনতার এত বছর পরও এইসব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পেশার মানুষ বাংলায় লিখতে ও বলতে পারেন না? কেন বিশেষায়িত ও উচ্চশিক্ষা ইংরেজি ছাড়া সম্ভব নয়?

স্বাধীনতার এত বছর পরও উচ্চশিক্ষা কেন ইংরেজি ছাড়া সম্ভব নয়? অজুহাত হিসেবে শোনা যায়, বিশেষায়িত ও উচ্চশিক্ষার বই বাংলায় নেই। নেই কেন, অনুবাদ হয়নি বলে? তা যারা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য পর্যায়ে এসব বিষয় পড়ান তারাও এসব বই অনুবাদ করতে পারেন না? তা হলে তারা কী পড়ান ও কী করে পড়ান? শিক্ষকদের পদোন্নতির সঙ্গে ক্লাসের বইয়ের অনুবাদ যুক্ত করে দিলেই খুব সহজে কাজটা হয়ে যায়।

এর অর্থ এই নয় যে, ইংরেজি শিক্ষার কোনো প্রয়োজন নেই, বা হুট করে শিক্ষা থেকে ইংরেজি তুলে দিতে হবে। প্রয়োজন আছে তো অবশ্যই। শুধু ইংরেজি কেন, যে কোনো বিদেশি ভাষা শিক্ষারই মূল্য আছে। একাধিক ভাষা জানা নিঃসন্দেহে একটি ভাল গুণ। আর আজকাল একটি দেশে যত বেশি মানুষ বিভিন্ন ভাষা জানবে সেই দেশের তত মঙ্গল, কারণ তাদের তত বেশি আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির সম্ভাবনা। কিন্তু সেই ভাষা শিক্ষাটা হতে হবে সম্পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছা নির্ভর, বাধ্যতামূলক নয়। প্রয়োজন আন্তরিক কার্যকর দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য ও মূল কথা তো এই–কোনো ভাষার প্রতি বিদ্বেষ নয়, 'সকল ভাষার সমান মর্যাদা'। অথচ দোকানের নামফলকে, উচ্চশিক্ষার বিদ্যালয়ে, আদালত প্রাঙ্গণে, ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনে, পরীক্ষাযুদ্ধে, চাকরির আবেদনে–এ দেশে সর্বত্র একটি ভাষার আধিপত্য, তা হলো ইংরেজি।

"একুশে ফেব্রুয়ারী" সংকলনে "সকল ভাষার সমান মর্যাদা"র লেখক আলী আশরাফ তখনই সতর্ক করেছিলেন, "২১শে ফেব্রুয়ারীর সে গৌরবময় গণ-জাগরণের সামনে স্বৈরাচারী লীগ শাসনকে সাময়িকভাবে হলেও পিছু হটতে হয়েছে। তার প্রমাণ হলো যে, শাসনতন্ত্রের মূলনীতি কমিটির রিপোর্টে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নই এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। স্বৈরাচারী শাসকচক্রের এখন এ সাহস নেই যে, প্রকাশ্য ঘোষণা করতে পারে "উর্দ্দুই হবে রাষ্ট্রভাষা।" তাই তারা চুপ করে আছে। এটা তাদের দুর্বলতার লক্ষণ। তবে, তাদের এ নীরবতার আর একটা দিক আছে। প্রথমতঃ এ নীরবতার ফাঁকে এখনও কার্যতঃ ইংরেজী "রাষ্ট্রভাষা রূপে" চালু থেকে যাচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ স্কুল-কলেজে উর্দ্দুকে বাধ্যতামূলক করে এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার কার্য পরিচালনায় উর্দ্দুভাষাকে প্রাধান্য দিয়ে শাসকচক্র অপেক্ষা করছে সুযোগের সন্ধানে।"

অর্থাৎ উর্দুকে নামকাওয়াস্তে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে রেখে কার্যত ইংরেজিকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় রেখে দেয়ার অভিসন্ধি। স্পষ্টতই তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠির দুটি দুরভিসন্ধির উল্লেখ করেছেন উক্ত ঐতিহাসিক প্রবন্ধটির লেখক। প্রথম হচ্ছে বাংলার দাবিকে কৌশলে পাশ কাটিয়ে উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় রাখা। দ্বিতীয়টি আরও কূটবুদ্ধিমূলক–কার্যত ইংরেজিকেই রাষ্ট্রভাষার স্থানে রাখা। বায়ান্নয় আমরা পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠির প্রথম দুরভিসন্ধিকে প্রতিহত করেছি ও আন্দোলনের সেই গতিবেগকে বাংলাদেশের স্বাধীনতায় রূপান্তর করেছি।

কিন্তু ভাষার লড়াইটা বাংলাদেশে ও বিশ্বে এখনও শেষ হয়নি–চলছেই।

# জয় হোক পাঠাগারের

## আবদুস ছাত্তার খান

২০২২ সালে জুনের তিন তারিখে ঢাকার সংস্কৃতি বিকাশ কেন্দ্রে ভূঞাপুরের অর্জুনাতে একটা পাঠাগার সম্মেলনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ডিসেম্বরের ২২, ২৩ ও ২৪ এই তিনব্যাপী সম্মেলন।

সম্মেলনকে সফল করতে করা হয় বেশ কয়েকটি উপ-কমিটি। কেউ কেউ বিভাগে বিভাগে সফরে বের হয়। কেউ কেউ গবেষণার কাজে পাঠাগারে পাঠাগারে জরিপের কাজ চালায়, শামীম আকন্দের নেতৃত্বে চলে প্রচার ও প্রকাশনার কাজ। অসাধারণ সব ডিজাইনের পোস্টার বের হয়ে আসে তার হাত দিয়ে। এরকম তাদের নানামুখী কর্মকাণ্ডে দেশের ১৭০টি পাঠাগারের পাঁচশতাধিক সংগঠক নিবন্ধন করে সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য।

নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে ডিসেম্বরের ২২ তারিখে শুরু হয় সম্মেলন। তীব্র শীতকে অতিক্রম করে পাঠাগার সংগঠকদের এক মিলনমেলায় পরিণত হয় এই সম্মেলন।

কতো মানুষের অংশগ্রহণে যে এই সম্মেলন সফল হয়েছে তা বলে শেষ করা যাবে না। মানুষ মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন ও বিশিষ্ট লেখক কামরুল মুজাহীদ ভাইয়ের সহযোগিতায় সংগ্রহ হয় কম্বল। অভয়ারণ্য সংগঠনের সহযোগিতায় গাছের ওপর গাছের নাম লিখে দেয়া হয়। কায়সার ভাই অর্থসংগ্রহে সহযোগিতা করেন। অস্ট্রেলিয়া থেকে শাহরিয়ার ভাই, কানাডা থেকে শফিক ভাই, যুক্তরাষ্ট্র থেকে চন্দ্রনাথ দাদা, সুইডেন থেকে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ভাই নানাভাবে সহযোগিতা করেন এই সম্মেলনকে সফল করার জন্য। দেশের ও দেশের বাইরের এরকম অসংখ্য সাধারণ মানুষের সহযোগিতায় আমরা সাহস পাই। ভরসা করি সাধারণ মানুষের শক্তিতে।

সম্মেলনে নতুন মাত্রা যোগ করে ঢাকার প্রকাশকদের অংশগ্রহণ। এই ক্ষেত্রে যার ঋণ অস্বীকার করলে পাপ হবে তিনি হলেন অ্যাডর্ন পাবলিকেশনের কর্ণধার জাকির ভাই। ঢাকার এতো প্রকাশকদের তিনি রাজি করিয়েছিলেন আমাদের এই অজপাড়াগাঁয়ে নিয়ে আসতে। বইপাঠ প্রতিযোগিতার আয়োজন ও তার পুরস্কারের ব্যবস্থা করার জন্যও আমরা তার প্রতি কৃতজ্ঞ।

বেসরকারি গণগ্রন্থাগারগুলোকে নিজের টাকায়, নিজের খরচে বই উপহার দেয়া দুই গ্রন্থসুহৃদের উপস্থিতি ছিলো চোখে পড়ার মতো। কাজী এমদাদুল হক খোকন ভাই ও রাজেন্দ্র দাদাকে ঘিরে সংগঠকদের ছিলো নানামুখী আড্ডা।

এই সম্মেলনে আত্মপ্রকাশ করে গ্রাম প্রকাশনী নামের একটি প্রকাশনী সংস্থা যারা শিশু-কিশোরদের জন্য বই প্রকাশে অঙ্গীকারবদ্ধ। বাঘিনীর মাতৃত্বের তিন বছর নামে একটি বই প্রকাশের মধ্য দিয়ে শুরু হলো তাদের পথচলা।

সম্মেলনকে সফল করার জন্য ছিলো স্বেচ্ছাসেবকদের অদম্য প্রচেষ্টা। দিনরাত তারা কাজ করেছেন। ইবরাহীম খাঁর আলোকিত ভূঞাপুর, ভূঞাপুর ব্লাডব্যাংক, শুশুয়া ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, শুভ শক্তি বাংলাদেশ, রেড ক্রিসেন্ট, স্কাউট, গঙ্গাফড়িং শিল্পীগোষ্ঠী, অর্জুনা অন্বেষা পাঠাগার ইত্যাদির প্রায় শতাধিক স্বেচ্ছাসেবক অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। আগত মেহমানদের যেন কোন কষ্ট না হয়

তার দিকে ছিলো তাদের সজাগ দৃষ্টি। তাদের এই ত্যাগ কোনো ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা যাবে না।

রানু, শান্তা, রাজু, অনন্ত, রাকিব প্রমুখের নেতৃত্ব ছিলো অতুলনীয়। আশা করি আগামীতেও এভাবেই নেতৃত্ব দিবে তোমরা। তমালের কারণেই শেষ পর্যন্ত 'প্রয়াগ' সাময়িকীটা তুলে দিতে পারি সংগঠকদের হাতে, ধন্যবাদ তাকে। ধন্যবাদ সূর্য ভাইকে বাকীতে ক্রেস্ট ও টিশার্টের ব্যবস্থা করে দেয়ার জন্য। ধন্যবাদ সেইসব প্রতিষ্ঠানকে যারা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন স্মরণিকার জন্য। ধন্যবাদ প্রশাসনকে, ধন্যবাদ মিডিয়া কর্মীদের আর ধন্যবাদ জুলিয়াস সিজারকে দক্ষ নেতৃত্ব দেয়ার জন্যে। এতো এতো মানুষ এই সম্মেলনকে সফল করার জন্য কাজ করেছেন তাদের নাম বলে আমি শেষ করতে পারবো না। আপনাদের প্রতি রইলো অসীম ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা।

সম্মেলনের যতটুকু ব্যর্থতা সে সব আমার অযোগ্যতা হিসেবে আমি বিবেচনা করে নিচ্ছি। যতটুকু ত্রুটি আছে আশা করি সেইসব কাটিয়ে আগামীতে আবারও বসবে পাঠাগারের সংগঠকদের প্রাণের এই মিলনমেলা।

# পাবনার কাশীনাথপুরে শিক্ষার্থীদের জন্য চন্দ্রবিন্দুর আয়োজন

২৮ ডিসেম্বর ২০২২এ পাবনার কাশীনাথপুরে শহীদ নুরুল হোসেন ডিগ্রি কলেজে স্থানীয় সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন 'চন্দ্রবিন্দু' ও ক্রিসেন্ট হাসপাতালের উদ্যোগে বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের নিয়ে আয়োজিত হয় 'উদ্দীপনা পুরস্কার ২০২২'। এতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইনজীবী শেখ গোলাম হাফিজ ও শিক্ষালোকের নির্বাহী সম্পাদক আলমগীর খানসহ তড়িৎ কুমার কুন্ডু, আক্কাস হোসেন, মিকাইল হোসেন ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তি। কাশিনাথপুর ডিজিটাল স্কুল ও কলেজ, কাশিনাথপুর কলেজিয়েট স্কুল, সৈয়দপুর উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ, ধোবাখোলা করোনেশন উচ্চবিদ্যালয় ও পাইকরহাটি শহীদ নগর উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী অনুষ্ঠানে আবৃত্তি, বিতর্ক ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন 'চন্দ্রবিন্দু'র সভাপতি সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মো. হুমায়ুন কবীর ও এটি সঞ্চালন করেন সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক ও শহীদ নুরুল হোসেন ডিগ্রি কলেজের বাংলা বিভাগের সহকারি অধ্যাপক মো. মাহবুব হোসেন। শিক্ষার্থীদের মেধা, সুকুমার বৃত্তি ও সাংস্কৃতিক চেতনা বিকাশে এ ধরনের অনুষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আলোচকগণ মত প্রকাশ করেন।

# পাঠাগার সম্মেলন ২০২২-এর
# সফল আয়োজন

২২-২৪ ডিসেম্বরে টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুরের নিভৃত গ্রাম অর্জুনায় হাজী ইসমাইল খাঁ বেসরকারি কারিগরি কলেজে সম্মিলিত পাঠাগার আন্দোলনের উদ্যোগে আয়োজিত হলো সমাজের আলোকিত মানুষদের এক মহামিলনমেলা–পাঠাগার সম্মেলন ২০২২। এই আলোকিত মানুষেরা জ্ঞানের আলোয় নিজেরা আলোকিত হয়েই ক্ষান্ত হননি, আলোকিত করতে চেয়েছেন সমস্ত দেশকে, স্বয়ং আলোকবর্তিকা হয়ে প্রজন্মকে দেখাতে চান পথ, হতে চান আলোর দিশারী।

জ্ঞাননির্ভর ন্যায়ভিত্তিক সমাজ নির্মাণের লক্ষ্যে "পাঠাগার হোক গণমানুষের বিশ্ববিদ্যালয়"–এই স্লোগানকে সামনে রেখে সারাদেশে বেসরকারিভাবে গড়ে ওঠা পাঠাগারের সংগঠকদের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ বৃদ্ধি, ভাববিনিময়, সাংগঠনিক নানা বিষয় নিয়ে মতবিনিময়, সরকারের কাছে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া তুলে ধরতে ও পাঠাগারগুলোর চিন্তার ঐক্যসূত্র গড়ে তুলতে সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। পৌষ মাসের তীব্র শীত উপেক্ষা করে সারাদেশের নানা প্রান্ত থেকে ১৭০টি পাঠাগারের প্রায় ৪০০ জন স্বপ্নবান মানুষ জড়ো হয়েছিল সম্মেলনকে সফল করতে। তাদের প্রত্যেকের চোখে ছিল স্বপ্ন, মনে সমাজ বদলের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। জ্ঞানের আলোকচ্ছটায় দেশকে উদ্ভাসিত করার প্রবল ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য যুক্ত হন সবাই, একাত্মতা ঘোষনা করেন সম্মিলিত পাঠাগার আন্দোলনের সাথে।

তিনদিনব্যাপি এই মহা আয়োজন মুখরিত হয়ে উঠেছিল শতশত আলোর দিশারী, বইপ্রেমী, জ্ঞানান্বেষু, কবি, লেখক, গবেষক, সমাজচিন্তক, সংস্কৃতিকর্মীর পদচারণায়। সংগীত, কবিতা আবৃত্তি, নাটিকা, গম্ভীরা, ভাওয়াইয়া, বরেণ্য আলোচকদের আলোচনা ও মুক্ত আলোচনায় সাজানো তিনদিনের আয়োজনটি ছিল স্বকীয়তায় সমৃদ্ধ।

উদ্বোধনী পর্বে লেখক ও গ্রন্থ-বিশেষজ্ঞ খান মাহবুব তার বক্তব্যে পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, "যে কোনো জাতিরাষ্ট্র বিনির্মাণে পাঠাগার খুব দরকার। মানুষের দুই ধরনের ডেভেলপমেন্ট আছে–একটি ভিজিবল, আরেকটি ইনভিজিবল, যেটাকে আমরা বেশি গুরুত্ব দেই না। যেমন, এই যে মানুষের মনোজাগতিক যেসব বিষয় আছে–মনের গঠন, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ইত্যাদি। মানুষের সঙ্গে মানুষের পার্থক্যটা হয় তার আচরণ, রুচির মধ্য দিয়ে। সংস্কৃতির মধ্য দিয়েই মানুষকে অন্যদের থেকে আলাদা করা যায়। এর জন্য পাঠাগারটা দরকার এবং পাঠাগারকে বলা হয় গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক অস্ত্রাগার, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বা আরও অনেক কিছু। পাঠাগার সম্পর্কে বইপুস্তকে অনেক স্তুতিবাক্য আছে–পাঠাগার অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করে। মানুষকে মানুষ করার জন্য বইয়ের সাথে আত্মীয়তা করা দরকার।" তিনি আরও বলেন, "প্রতি ৩ হাজার জন মানুষের জন্য একটি ছোট আকারের, প্রতি ২০ হাজার জনের জন্য একটি মাঝারি আকারের ও প্রতি ৫০ হাজার মানুষের জন্য একটি বড় আকারের পাঠাগার প্রয়োজন।"

সম্মিলিত পাঠাগার আন্দোলনকে সফল করার নিমিত্তে সম্মেলনের যে আলোচ্য বিষয়গুলো নির্ধারণ করা হয় তা ছিল চমকপ্রদ ও গুরুত্ববহ। মোটাদাগে আলোচ্য বিষয়গুলো ছিলো নিম্নরূপ:

- পাঠাগার হোক গণমানুষের বিশ্ববিদ্যালয়।
- প্রত্নসম্পদ রক্ষায় পাঠাগার আন্দোলনের ভূমিকা।
- জাতিগঠনে বই পাঠ ও পাঠাগার স্থাপনের ভূমিকা।
- দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে পাঠাগারের ভূমিকা।

- স্থানীয় সংস্কৃতি রক্ষায় পাঠাগারের ভূমিকা।
- ডিজিটালাইজড ও আধুনিক পাঠাগার স্থাপন।
- আর্তমানবতার সেবায় পাঠাগারের ভূমিকা।
- পাঠাগার আন্দোলন: সংকট, উত্তরণ ও সম্ভাবনা বিষয়ক গবেষণার প্রাথমিক ফলাফল।
- শিশুর মানসিক বিকাশে শিল্পচর্চার গুরুত্ব ও পাঠাগারের ভূমিকা।
- গণমানুষের মানস চৈতন্য উন্নয়নে পাঠাগারের ভূমিকা। এবং
- বেসরকারি পাঠাগার বিকাশে সরকারের করণীয়, বেসরকারি গ্রন্থাগারের দাবিদাওয়া ও প্রত্যাশা।

কবি ও গবেষক ইমরান মাহফুজ তার আলোচনায় বলেন, "সমাজে কোন মানুষের শরীরের জন্য যেমন খাদ্যের দরকার, তেমনি মনের খাদ্যও তার প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মেটাতে পারে বই, পাঠাগার। পাঠাগার মানুষের মনকে আনন্দ দেয়। জ্ঞান প্রসারে রুচিবোধ জাগ্রত হয়।" তিনি বলেন বই হাতে, মোবাইলে, যে যেভাবে পড়ে পড়ুক, অন্তত পড়ুক; কিংবা অডিও শুনুক–তবু জানুক আগামিকে। কারণ হতাশা কাটাতে ও দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের জন্য দরকার পড়ুয়া সমাজ। প্রকৃত জ্ঞানার্জন ও প্রাণশক্তি বৃদ্ধির জন্য দেশের সবখানে পাঠাগার প্রতিষ্ঠা কিংবা অনলাইনে পাঠাগার পরিচালনার জন্য সবার আন্তরিকতা অত্যন্ত জরুরি।

পাঠাগারের সংকট দূর করতে তিনি ৫টি প্রস্তাব পেশ করেন:

- কেবল বই পড়ার কাজ না করে পাঠাগারগুলোকে সাংস্কৃতিক ক্লাবে রুপান্তর করা; যেমন- আবৃত্তি, বিতর্ক, রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে। পাশাপাশি গানের আড্ডা এবং সেগুলো পাঠাগারের ফেসবুক, ইউটিউবে প্রচার করে অন্যদের উৎসাহিত করা। এভাবে পাঠাগারগুলো নতুনভাবে জেগে উঠবে।
- পাঠকের চাহিদামতো বই সংগ্রহ করা; যে এলাকায় যে মানের পাঠক/শিক্ষার্থী আছে সেই মানের বই রাখা; বিশেষ করে এলাকাভিত্তিক।
- ইতিহাস ও স্মরণীয় ব্যক্তিদের গুরুত্ব দিয়ে তাদের জীবন ও কর্মকে ছড়িয়ে দেয়া।
- অনেক পাঠাগারের এখনো আধুনিকায়ন হয়নি; সেখানে বইয়ের সূত্র ধরে ইন্টারনেট থেকে নতুন কিছু জানতে সাহায্য করা; বিখ্যাত বই থেকে যেসব নাটক, সিনেমা হয়েছে সেগুলো দেখানোর ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।
- লেখক-আড্ডা ছাড়াও এলাকার কৃতি শিক্ষক, ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনানিদের জীবনের গল্প শোনানোর আয়োজন করা। এমন আড্ডা-আলাপে জ্ঞান বিনিময় হয়, ছড়িয়ে পড়ে আলো চারদিকে। নতুনেরা চেনে চিরায়ত মানুষকে।
- পাঠাগারে একজন গ্রন্থাগারিক রাখা জরুরি, যিনি বই পড়েন; কারণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে পাঠাগার নিয়মিত খোলা রাখা; গ্রন্থাগারিক না থাকলে কোন কাজই ঠিকমতো হবে না। বেসরকারি অধিকাংশ পাঠাগারে গ্রন্থাগারিক নেই এবং পাঠাগারে সরকারি-বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতাও খুব কম; ফলে বেশিরভাগ পাঠাগারও থাকে বন্ধ। তাই যেকোন উপায়ে (সরকারি/বেসরকারি অনুদানে) একজন গ্রন্থাগারিক রাখা অত্যাবশ্যক।

সুনামগঞ্জ থেকে সম্মেলনে যোগ দিতে আসা দ্বাদশ শ্রেণির স্বপ্নবাজ কিশোর স্বপ্ন রাজ তার সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে ৬৪ জেলার উদ্দেশ্যে, জেলায় জেলায় ঘুরে বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীদের বই পড়ার প্রতি উৎসাহিত করতে। সে তার তিনটি পর্যবেক্ষণ সবার সামনে উপস্থাপন করে:

১. বাবা-মায়েরা চান না ছেলেমেয়েরা পাঠ্যবইয়ের বাইরে অন্য কোনো বই পড়ুক।

২. শিক্ষকরা নিজে বই কম পড়েন বিধায় শিক্ষার্থীদেরও বই পড়তে আগ্রহী করে তুলতে তেমন কোন ভূমিকা রাখেন না।

৩. শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রচণ্ডরকম মোবাইল আসক্তি তৈরি হওয়ার ফলে শিক্ষার্থীরা পাঠবিমুখ।

সম্মেলনে আগত আলোর দিশারীদের হাত ধরে সম্মিলিত পাঠাগার আন্দোলনের 'প্রতিটি গ্রামে অন্তত একটি পাঠাগার গড়ে উঠার স্বপ্ন' বাস্তবায়ন সফল হোক। প্রতিটি পাঠাগার হয়ে উঠুক গণমানুষের বিশ্ববিদ্যালয়। জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে পড়ুক দেশের প্রতিটি কোণে, আলোয় উদ্ভাসিত হোক সমগ্র দেশ।

- মোহাম্মদ মাহবুব উল আলম

# পার্বত্য জেলার দর্শনীয় স্থানে ভ্রমণ

ড. আশরাফ পিন্টু

অনেক দিন থেকেই মনের গহীনে ভ্রমণের ইচ্ছাটা লুক্কায়িত ছিল কিন্তু সময় ও সুযোগের অভাবে তা হয়ে ওঠেনি। সুযোগটা পেলাম শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে ১০ দিনের ছুটি পাবার পর। আমাদের কলেজের কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর বাংলাদেশের পার্বত্য জেলার ঐতিহ্যবাহী দর্শনীয় স্থানগুলোতে ভ্রমণের সিদ্ধান্ত হলো। তো ১ অক্টোবর আমরা ৮ জন যাত্রা করলাম খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটি পার্বত্য জেলার দর্শনীয় স্থানগুলো দেখার উপলক্ষ্যে।

পাবনার বেড়া থেকে দুপুর আড়াইটায় ঢাকাগামী কোচে উঠলাম। ওখান থেকে গাড়ি বদল করে রাত ৯টায় উঠলাম খাখড়াছড়ির শান্তি পরিবহনে। খাগড়াছড়ির পাহাড়ি অঞ্চলের আঁকাবাঁকা রাস্তা আর একটু পর পরই মোড়; গাড়ির ঝাঁকুনিতে আমার মাথা ধরে গেল। সারারাত্রি ধরে একটানা দীর্ঘভ্রমণ আমার জীবনে এই প্রথম। আমি জার্নিতে খুব দুর্বল; কিন্তু গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর মনোবল দৃঢ়। যাহোক, ভোর ৬টার দিকে আমরা খাগড়াছড়ি বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে গেলাম। ওখান থেকে চাঁদের গাড়ি ভাড়া করে রওনা দিলাম সাজেক ভ্যালির উদ্দেশ্যে।

সাজেক ভ্যালি রাঙামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার অন্তর্গত সাজেক ইউনিয়নের একটি বিখ্যাত পর্যটন স্থল। এটি রাঙামাটি জেলার সর্বউত্তরে ভারতের মিজোরাম সীমান্তে অবস্থিত। কর্ণফুলী নদী থেকে উদ্ভূত সাজেক নদী থেকে সাজেক ভ্যালির নামকরণ হয়েছে। সাজেক বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ইউনিয়ন, যার আয়তন ৭০২ বর্গমাইল। এর উত্তরে ভারতের ত্রিপুড়া, দক্ষিণে রাঙামাটির লংগদু, পূর্বে ভারতের মিজোরাম ও পশ্চিমে খাগড়াছড়ির দীঘিনালা উপজেলা অবস্থিত। খাগড়াছড়ি জেলা সদর থেকে সাজেকের দূরত্ব প্রায় ৭০ কিলোমিটার। আর দীঘিনালা থেকে প্রায় ৪৯ কিলোমিটার। সাজেক রাঙামাটি জেলায় অবস্থিত হলেও খাগড়াছড়ি থেকে এখানে যাতায়াত সুবিধাজনক। খাগড়াছড়ি থেকে দীঘিনালায় নাস্তা সেরে সেনাবাহিনীর গাড়ির প্রহরায় আমাদের গাড়ি ১১টার দিকে ছেড়ে দিলো। চারিদিকে মনোরম নৈসর্গিক দৃশ্য। উঁচু উঁচু পাহাড়, পাশেই গভীর খাদ; মাঝখান দিয়ে উঁচু-নিচু, আঁকাবাঁকা সরু রাস্তা দিয়ে আমাদের গাড়ি এগিয়ে চলছে। রাস্তার দু'পাশে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা (আদিবাসীসন্তান) হাত নেড়ে টা টা জানাচ্ছে।

ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ১৮০০ ফুট উচ্চতার সাজেক ভ্যালি যেন এক প্রাকৃতিক ভূ-স্বর্গ। প্রকৃতি এখানে সকাল বিকাল রঙ বদলায়। চারপাশে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো বিস্তীর্ণ পাহাড়ের সারি, আর তুলোর মতো মেঘ, এরই মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে নৈসর্গিক এ উপত্যকা। কাঠ আর বাঁশ দিয়ে তৈরি এক মনোরম রিসোর্টে আমরা আগে থেকেই সিট বুকিং দিয়ে রেখেছিলাম। দুপুরের খাবার খেয়ে একটু রেস্ট নিয়ে বিকেলে বেড়ালাম প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করার জন্য।

সাজেক রুইলুইপাড়া, হামারিপাড়া এবং কংলাকপাড়া, এই তিনটি পাড়ার সমন্বয়ে গঠিত। ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত রুইলুইপাড়া সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১,৭২০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত আর কংলাকপাড়া ১,৮০০ ফুট উচ্চতায় কংলাক পাহাড়-এ অবস্থিত। সাজেকে মূলত লুসাই, পাংখোয়া এবং ত্রিপুরা উপজাতি বসবাস করে। রাঙামাটির অনেকটা অংশই দেখা যায় সাজেক ভ্যালি থেকে। এই জন্য সাজেক ভ্যালিকে রাঙামাটির ছাদও বলা হয়। আমাদের রিসোর্ট যেখানে অবস্থিত তার কাছেই কংলাক পাহাড়। এখানে দাঁড়িয়ে ভারতের মিজোরাম রাজ্যের পাহাড়গুলোও দেখা যায়।

সাজেকের আদি বাসিন্দারা হলো ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মানুষ। বিশেষ করে চাকমা, লুসাই, পাংখোয়া ও ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীরা বহু আদিকাল থেকে বসবাস করে আসছে। তাদের বাড়িঘর বাঁশের মাচাংয়ের উপর তৈরি করা। কিছু বাঙালি রয়েছে যারা বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত; জীবিকার তাগিদে এখানে এসে স্থায়ী হয়েছে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মানুষেরা বেশ সহজ-সরল এবং প্রায় এক কথার মানুষ। কোনো কিছু কেনার সময় বেশি দামাদামি করলেও তার কথায় অটুট থাকে। এখানে রয়েছে বাঁশের বহুবিধ ব্যবহার। ঘর-বাড়ি বাঁশ দিয়ে তৈরি ছাড়াও চা-কফি খেতে বাঁশের কাপের ব্যবহার রয়েছে; রয়েছে 'ব্যাম্বু চিকেন' যা বাঁশের চোঙের মধ্যে দিয়ে আগুনে পুড়িয়ে তৈরি করা হয়। আদিবাসীদের হুকাও বাঁশের চোঙ দ্বারা তৈরি।

আমাদের মধ্যে রওশন সাহেব (হিসাব বিজ্ঞানের স্যার) খুব ভ্রমণপ্রিয় লোক। কাকডাকা ভোরে রওশন সাহেব সবাইকে ডেকে তুললেন পাহাড়ি-মেঘের মনোরম

*একজন আদিবাসী হুকা খাচ্ছে*

দৃশ্য উপভোগ করার জন্য। বাংলোর পিছনের দরজা খুলে বেলকুনিতে দাঁড়াতেই অভিভূত হয়ে গেলাম। এ এক অভূতপূর্ব দৃশ্য! সাদাকালো মেঘ পাহাড় ছেয়ে আছে। এ যে মেঘের রাজ্য! আস্তে আস্তে মেঘগুলো যেন রং বদলাচ্ছে। একটু পর পর দৃশ্যান্তর হচ্ছে। রোদ বাড়ার সাথে সাথে পাহাড়ের গাছের কোথাও সোনালি রোদ্দুরের

ঝিলিমিলি আবার কোথাও মেঘের ছায়ার মিতালি।

খাগড়াছড়ি ফিরে আমরা বিকেলে যাত্রা করলাম 'আলুটিলা গুহা' ও 'রিসাং ঝর্ণা'-এর উদ্দেশে। আলুটিলা গুহা খাগড়াছড়ি জেলায় আলুটিলা পর্যটন কেন্দ্রে অবস্থিত একটি প্রাকৃতিক গুহার নাম। স্থানীয়দের কাছে আলুটিলা গুহা 'মাতাই হাকড়' বা 'দেবতার গুহা' নামে পরিচিত। আলুটিলা গুহার দৈর্ঘ্য ৩৫০ ফুট। গুহার ভেতরে সব সময় অন্ধকার থাকে এজন্য গুহায় প্রবেশ করতে হলে মশালের প্রয়োজন হয়। গুহার বাইরে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে, ভিতরে ঝর্ণার মতো পানি গড়িয়ে আসছে (তবে তা অল্প পরিমাণে)। পানির মৃদু স্রোতে পাথরের পথ মানুষের জুতো-স্যান্ডেলের পায়ের কাদায় তা পিচ্ছিল হয়ে উঠেছে। গুহার ভিতরে মশাল না নিয়ে ঢোকার কারণে এক মহাবিপদে পড়ে গেলাম। ভিতরে নিকষ কালো অন্ধকার। মোবাইল টর্চের মৃদু আলোয় গুহার দেয়ালে পড়ে এক ভূতরে পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের দলের সবাই বিশেষ করে তরুণ শিক্ষক মেহেদী, আমিরুল সবার আগে চলে গেছে। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সিনিয়র শিক্ষক জমিন ভাই বয়সে প্রবীণ হলেও তিনি নবীনদের মতো উদ্যমী। তিনিও তাদের সঙ্গে আগে চলে গেছেন। সবার পিছনে পড়েছি আমি এবং আমার আগে আছেন উপাধ্যক্ষ মাসুদুর রহমান। আমার ভয় হচ্ছে গুহার পাথরের ফাঁকে কখন যেন আমার পা আটকে যায়। আমার অসহায় দৃশ্য দেখে আমাদের পদার্থ বিজ্ঞানের তরুণ শিক্ষক নুর ইসলাম মোবাইলের টর্চধরে আমাকে রাস্তা পার করে দিলো। গুহার শেষ মাথায় পৌঁছে আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। তবে এ যেন এক ভয়ংকর-সুন্দর দৃশ্যের অবলোকন এবং বিরল অভিজ্ঞতা অর্জন।

আলুটিলা গুহার একটু দূরে 'রিসাং ঝর্ণা'। আলুটিলা পর্যটন কেন্দ্র হতে এই ঝর্ণার দূরত্ব মাত্র ৩ কিলোমিটার। মাটিরাঙা উপজেলার সাপমারা গ্রামে অপূর্ব সুন্দর রিসাং ঝর্ণার অবস্থান। স্থানীয়দের কাছে রিসাং ঝর্ণা 'সাপ মারা রিসাং ঝর্ণা' নামে পরিচিত। মারমা শব্দ 'রিসাং'-এর অর্থ

*রিসাং ঝর্ণার পাদদেশে লেখক ও অন্যান্যরা*

কোনো উঁচু স্থান হতে জলরাশি গড়িয়ে পড়া। রিসাং ঝর্ণার অপর নাম 'তেরাং তৈকালাই'। প্রায় ৩০ মিটার উচ্চতার পাহাড় থেকে পানি আছড়ে পড়ার এ ঝর্ণার মনোরম দৃশ্য ঘন্টার পর ঘন্টা উপভোগ করার মতো। শুধু দেখে নয়, এ ঝর্ণার পানিতে গোসল করে অনেকে মজা উপভোগ করছে। আমারও মন চাইছিল ঝর্ণার পানিতে গা ভেজাতে কিন্তু বিধিবাম! আমাদের সে প্রস্তুতি ছিল না।

পরের দিন সকালে আমরা রওনা দিলাম খাগড়াছড়ি হয়ে রাঙামাটির কাপ্তাই লেকের উদ্দেশ্যে। সকাল ১১টার দিকে রাঙামাটি পৌঁছানোর পর আমরা একটি ইঞ্জিনচালিত বোট ভাড়া করলাম। কাপ্তাই লেকের অথই জলরাশিতে চলছে আমাদের বোট, চারপাশ ঘিরে রয়েছে ছোট বড় পাহাড়, ঝর্ণা আর চোখ জুড়ানো সবুজের সমারোহে। যেখানে সবসময় চলে জলের সাথে সবুজের মিতালি। একদিকে যেমন পাহাড়ে রয়েছে বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্ভার তেমনি লেকের অথই জলে রয়েছে বহু প্রজাতির মাছ ও অফুরন্ত জীববৈচিত্র্য।

১১,০০০ বর্গ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত এই কৃত্রিম হ্রদ দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে আয়তনে সর্ববৃহৎ। ১৯৫৬ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার আমেরিকার অর্থায়নে পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য কর্ণফুলি নদীর উপর কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ করে, ফলে রাঙামাটি জেলার ৫৪ হাজার একর কৃষি জমি প্লাবিত হয়ে এই কাপ্তাই লেকের সৃষ্টি হয়।

# পাহাড়ে–মুনলাই

## ডা. তোফাজ্জল হোসেন তারা

আমরা কজন বেড়াতে যাব
সাঙগু নদীর ওপারে
রূপের মাধুরি কুমারী ঝর্না
কি অপরূপ আহারে।
আকাশে মেঘ নিচে ঝর্না
বয়ে চলে স্রোতধারা
হ্রদে ঘেরা বগা লেক পাহাড়
কেওকারাডং খাড়া।

নীলগিরি নীলাচল
চাঁদের গাড়ি চেপে চল
চিম্বুক পাহাড় তাজিংডং
ডিম পাহাড়ে যাবি বল?
মেঘের পাহাড় মেঘের রাজ্য
মেঘ বালিকার দেশ
নৈসর্গমণ্ডিত ভূ-স্বর্গ
রূপের নাই যে শেষ।

হাওয়ার বেগে মেঘ উড়ে যায়
ঘন কুয়াশার আদলে
ষোড়শী যৌবনা স্পর্শকাতর
বৃষ্টিস্নাত বাদলে।
থানচি তিন্দু রুমা বাজার
দার্জিলিং মুনলাই রূপের বাহার
রিমাক্রি ফল্‌স জলপ্রপাত।
নাফাখুম চিংড়ি রিঝুক পাহাড়।

ভেলা খুম দেবতা খুম
আমিয়া খুম সাংগুম
নিজ রূপে মোহিত তারা
শেষ বিকেলে রঙ্গন।
এত কিছু বর্ণনা করে
বলা যায় না ভাই
তুমা তুঙ্গি তিন্দু মুনলাই
চল দেখতে যাই।

*কাপ্তাই লেকের আদিবাসী বাজারে আদিবাসীদের দোকানে লেখক ও তার সহকর্মীবৃন্দ*

কাপ্তাই হ্রদের চারপাশে রয়েছে জুম পাহাড়, নির্বাণনগর মন্দির (বৌদ্ধ আদিবাসীদের মন্দির), আদিবাসী বাজার ইত্যাদি। পাহাড়গুলোতে সাজেকের মতো রয়েছে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মানুষের বসবাস। যাদের জীবনযাত্রা একেবারেই সাধারণ। পাহাড়ি মার্কেটে (আদিবাসী পল্লী) যাবার পর তাদের সদয় ব্যবহার আমাদের মুগ্ধ করল। আমরা অনেকেই তাদের দোকান থেকে বেডশিট, ঝিনুক বা পুতির মালা, বাঁশের তৈরি বিভিন্ন খেলনা, চায়ের কাপ ইত্যাদি কেনাকাটা করলাম।

ভ্রমণ শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু সময়-সুযোগ ও অর্থের অভাবে অনেক সময় তা হয়ে ওঠে না। আমরা ১ অক্টোবর- '২২ থেকে ৫ অক্টোবর- '২২ পর্যন্ত ভ্রমণে ছিলাম। আরো অনেক দর্শনীয় ও ঐতিহ্যবাহী স্থানে যাবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকেই বাড়িতে জরুরি কাজ ফেলে ভ্রমণে এসেছিল। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম আবার সময়-সুযোগ পেলে বাংলাদেশের দর্শনীয় ও ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলোতে ভ্রমণে বের হবো এবং তা পাঠকদের সামনে উপস্থাপনের চেষ্টা করব।

*লেখক: বিভাগীয় প্রধান, বাংলা, মনজুর কাদের মহিলা ডিগ্রি কলেজ, বেড়া, পাবনা।*

# সিদীপের এখন ২০১টি শাখা

বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় ক্রমাগত অবদান রেখে চলেছে সিদীপ। ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩এ আরো ২০টি নতুন শাখার কার্যক্রম শুরু করে সিদীপ তার কর্মক্ষেত্রের পরিধি আরো বাড়িয়ে নিয়েছে। সারাদেশে সিদীপের এখন ২০১টি শাখা।

সিদীপের শীর্ষ কর্মকর্তাগণ এই ২০টি নতুন শাখা উদ্বোধন করেন। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, ব্যাংক ম্যানেজার এবং ঋণগ্রহীতারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা জোনের ডেমরা শাখার উদ্বোধন করেন সিদীপের নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদা। এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন সিদীপের পরিচালক (মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম) জনাব এ. কে. এম. হাবিব উল্লাহ আজাদ এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

সিদীপের এই ২০টি নতুন শাখা হচ্ছে: মাদারীপুর জোনের ঘরিষার বাজার, জাঁজিরা, ভাঙ্গা, সালথা, সাহেবরামপুর ও কালকিনি; পাবনা জোনের এনায়েতপুর, কড্ডা, ঈশ্বরদী, আতাইকুলা, ধানুয়াঘাটা; রাজশাহী জোনের আত্রাই, আবাদপুকুর, দুর্গাপুর, বানেশ্বর, রহনপুর; কুমিল্লা জোনের রামমোহন; ব্রাহ্মণবাড়িয়া জোনের আখাউড়া ও আশুগঞ্জ এবং সোনারগাঁও জোনের ডেমরা।

## সিদীপে যথাযোগ্য মর্যাদায়

# শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত

ভাষা শহিদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ) যথাযথ মর্যাদায় পালন করেছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এ উপলক্ষে সিদীপ প্রধান কার্যালয়ের গ্রন্থাগার ও সভাকক্ষে এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। সিদীপের নির্বাহী পরিচালকসহ প্রধান কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী এতে অংশ নেন।

একুশে ফেব্রুয়ারি ভোরে নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদার নেতৃত্বে সিদীপের একটি প্রতিনিধি দল জাতীয় শহিদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে। এদিন সূর্যোদয়ের সময় সিদীপের প্রধান কার্যালয় এবং সব শাখা অফিসে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করে উত্তোলন করা হয়। সিদীপের সব শাখা অফিসের কর্মীগণ ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের নেতৃত্বে স্থানীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক নিবেদন করেন। শাখাগুলোতে দিবসটি উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় এবং সিদীপের কর্মীগণ স্থানীয় প্রশাসন আয়োজিত অনুষ্ঠানসমূহে অংশ নেন।

# সিদীপ প্রধান কার্যালয়ে পিঠা উৎসব

৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ সিদীপ প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হলো পিঠা উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রধান কার্যালয়ের সকল কর্মীদের অংশগ্রহণে সকাল ১১টায় পিঠা উৎসব উদ্বোধন করেন সিদীপের পরিচালক (ডিজিটাইজেশন) জনাব এস. আব্দুল আহাদ। উৎসবে সিদীপের প্রধান কার্যালয়ের কর্মীরা যার যার বাসা থেকে পিঠা বানিয়ে নিয়ে আসেন এবং সবাই মিলে একসাথে পিঠা খাওয়া পর্ব শেষ করেন। উক্ত পিঠা উৎসবকে কেন্দ্র করে আয়োজিত হয়েছে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। সিদীপ সাংস্কৃতিক দলের নানান পরিবেশনায় অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। দলীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করে একে একে শিল্পীরা গান, কবিতা ও নাচ পরিবেশন করেন। একক সংগীত পরিবেশন করেন আহসান হাবিব জয়, মো. তাওহিদুন্নবী, জাহিদুল ইসলাম পলাশ, মাহবুবুর রশীদ অরিস, নুরুন্নাহার নিশি ও মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, কবিতা আবৃত্তি করেন মিঠুন চন্দ্র দেব ও মো. মাহবুব উল আলম এবং নৃত্য পরিবেশন করেন আফরিন হোসেন ফারিতা। সংস্থার নারী কর্মীদের পিলো পাসিং খেলার মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়। খেলায় প্রথম স্থান অর্জন করেন পূবালী রাণী সূত্রধর, দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন পপি রাণী সাহা এবং তৃতীয় স্থান অর্জন করেন মাকসুদা আক্তার। পুরস্কার বিতরণী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদা সকলের সম্মিলিত এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

# মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার উদ্বোধন

এ বছর ১৯ জানুয়ারি সিদীপ সোনারগাঁ এরিয়ার আড়াইহাজার শাখার কর্ম-এলাকায় 'রোকনউদ্দিন মোল্লা গার্লস স্কুলে' মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার উদ্বোধন করা হয়। এ সময় বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক বাবু মৃদুল কান্তি পাল ও অন্যান্য শিক্ষক এবং সোনারগাঁর এরিয়া ম্যানেজার মহব্বত হোসেন, ব্রাঞ্চম্যানেজার মো: ইউনুস আলী, শিক্ষাসুপারভাইজার হাসিনা নার্গিসসহ প্রধান কার্যালয়ের গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা গাজী জাহিদ আহসান উপস্থিত ছিলেন।

২৯ জানুয়ারি সিদীপ তিতাস এরিয়ায় রায়পুর/গৌরীপুর শাখার কর্ম-এলাকায় ইলিয়টগঞ্জ রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ উচ্চ বিদ্যালয়ে উদ্বোধন হলো মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার। এ সময় বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক জনাব ওমর ফারুক ও অন্যান্য শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীবৃন্দের পাশাপাশি তিতাসের এরিয়া ম্যানেজার মো. হুমায়ুন, ব্রাঞ্চম্যানেজার গোলাম সারোয়ার, শিক্ষাসুপারভাইজার শিউলী আক্তার এবং সিদীপ প্রধান কার্যালয়ের গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা গাজী জাহিদ আহসান উপস্থিত ছিলেন। শাখার কর্মী, শিক্ষিকা ও এলাকাবাসীর সহযোগিতায় ৫০টি বই নিয়ে এ পাঠাগার যাত্রা শুরু করে।

৩০ জানুয়ারি সিদীপ চট্টগ্রাম এরিয়ায় বারইয়ার হাট শাখায় চিনকি আস্তানা উচ্চ বিদ্যালয়ে উদ্বোধন হলো মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার। বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক জনাব মোহাম্মদ মোকাররম হোসেন চৌধুরী দুইজন শিক্ষার্থীর হাতে বই তুলে দেয়ার মধ্য দিয়ে পাঠাগার উদ্বোধন করেন। এ সময় চট্টগ্রামের এরিয়া ম্যানেজার হাফেজ মোহাম্মদ তারেকুল ইসলাম, শাখাব্যবস্থাপক নিমাই চন্দ্র সরকার, শিক্ষাসুপারভাইজার নাজমা বেগম, গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা মো. মাহবুব উল আলম, সিদীপ উঠানস্কুলের কয়েকজন শিক্ষিকা এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

*সোনারগাঁ এরিয়ার আড়াইহাজার শাখার কর্ম-এলাকায় 'রোকনউদ্দিন মোল্লা গার্লস স্কুলে' মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার উদ্বোধন করা হয়*

*চট্টগ্রাম এরিয়ায় বারইয়ার হাট শাখায় চিনকি আস্তানা উচ্চ বিদ্যালয়ে উদ্বোধন হলো মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার*

*তিতাস এরিয়ায় রায়পুর/গৌরীপুর শাখার কর্ম-এলাকায় ইলিয়টগঞ্জ রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ উচ্চ বিদ্যালয়ে উদ্বোধন হলো মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার*

# মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারে
# সেরা পাঠক-পাঠিকা নির্বাচন ও পুরস্কার প্রদান

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারের উদ্যোগে ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ সিদীপের হাজীগঞ্জ এরিয়ার হাজীগঞ্জ শাখার কর্ম-এলাকায় হাজীগঞ্জ সরকারি মডেল পাইলট হাইস্কুল এন্ড কলেজে সেরা পাঠক-পাঠিকা নির্বাচন ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাজীগঞ্জ পাইলট হাই স্কুল এন্ড কলেজের প্রিন্সিপাল মো আবু সাইদ, সিদীপের গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা গাজী জাহিদ আহসান, হাজীগঞ্জের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার বিল্লাল হোসেন, শিক্ষাসুপারভাইজার রুখসানা আক্তার ইতি ও অন্যান্য কর্মী এবং স্কুলের ছাত্রছাত্রী। প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান অর্জন করে অষ্টম শ্রেণির ছাত্র অর্নব মজুমদার, ২য় স্থান অর্জন করে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী তানজিনা আক্তার এবং তৃতীয় স্থান অর্জন করে চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র আব্দুল্লাহ। অনুষ্ঠানে সেরা তিনজন পাঠক-পাঠিকার হাতে সিদীপের পক্ষ থেকে পুরস্কার হিসেবে বই তুলে দেয়া হয় এবং মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারে পাঠকদের জন্য নতুন আরও ১০টি বই উপহার দেয়া হয়।

৯ মার্চ ২০২৩এ সিদীপের নয়নপুর শাখার কর্ম-এলাকায় রাবেয়া মান্নান ভূঁইয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারের উদ্যোগে সেরা পাঠক-পাঠিকা নির্বাচন ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক জনাব মো. জসীম উদ্দিন এবং সহকারি শিক্ষক জেসমিন আক্তার উপিস্থত ছিলেন। এছাড়াও সিদীপ নয়নপুর শাখার ব্যবস্থাপক আল ইমরান হোসেন, উপসহকারি কমিউনিটি মেডিক্যাল অফিসার (SACMO) মোস্তাফিজুর রহমান, শিক্ষাসুপারভাইজার নাসরিন আক্তার এবং প্রধানকর্যালয়ের গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা মো. মাহবুব উল আলম উপস্থিত ছিলেন। প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে যথাক্রমে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী সামিরা ইসলাম ঝুমা, এসএসসি পরীক্ষার্থী তাসনিম আক্তার জেরিন এবং নিপা আক্তার। বিজয়ীদেরকে বই পুরস্কার দেয়া হয়। এছাড়াও সিদীপের পক্ষ থেকে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারের জন্য নতুন দশটি বই উপহার দেয়া হয়।

১২ মার্চ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলায় চারগাছ এন আই ভূঁইয়া উচ্চবিদ্যালয়ে সেরা পাঠক-পাঠিকাদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ ও বইপড়া নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সম্মানিত প্রধানশিক্ষক মো. মজিবর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন সিদীপ চারগাছের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মিজানুর রহমান। আলোচনা করেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক মোশারফ হোসেন, অন্যান্য শিক্ষক, শিক্ষাসুপারভাইজার নাজমা আক্তার, সমৃদ্ধি কর্মসূচির দীপক রঞ্জন দেবনাথসহ সিদীপ চারগাছ ব্রাঞ্চের কর্মকর্তাগণ। অতিথি হিসেবে ঢাকা থেকে সিদীপের গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা আলমগীর খান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সেরা পাঠক-পাঠিকা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করে মারজিয়া আক্তার, দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে তাইবা আক্তার এবং তৃতীয় স্থান অর্জন করে যৌথভাবে নুসরাত জাহান ও সাময়িা আক্তার। তারা সবাই বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী।

*হাজীগঞ্জ শাখার কর্ম-এলাকায় হাজীগঞ্জ সরকারি মডেল পাইলট হাইস্কুল এন্ড কলেজে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারে সেরা পাঠক-পাঠিকা নির্বাচন ও পুরস্কার বিতরণ*

*নয়নপুর শাখার কর্ম-এলাকায় রাবেয়া মান্নান ভূঁইয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারে সেরা পাঠক-পাঠিকা নির্বাচন ও পুরস্কার বিতরণ*

*ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলায় চারগাছ এন আই ভূঁইয়া উচ্চবিদ্যালয়ে সেরা পাঠক-পাঠিকাদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ*

# আশা

## ফজলুল বারি

বছরের এ সময়টায় শাফকাত সাহেব সাধারণত শুয়ে বিশ্রাম নেন না। কার্তিকের শেষে শীতের এই ছোট দিনে দুপুরের খাবার শেষ হতেই প্রায় সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। কিন্তু আজ খাওয়ার পর কেমন যেন পেটে একটু অস্বস্তিবোধ করছিলেন। বিছানায় শরীরটা এলিয়ে দিলেন। ভাবলেন একটু গড়াগড়ি দিয়ে আবার উঠে যাবেন। কেননা, সন্ধ্যায় ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। 'এপয়েন্টমেন্ট' করা আছে। তাই ঘুমানো যাবে না। কিন্তু শুয়েও শান্তি পাচ্ছিলেন না। পেটের অস্বস্তিটা মনে হয় কেবল বাড়ছেই। এপাশ ওপাশ করতে লাগলেন। স্ত্রী জয়াকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন ঔষধ খাবেন কিনা। জয়া কি একটা ট্যাবলেট এনে খাইয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পর মনে হল, একটু স্বস্তি এসেছে। কিন্তু স্বস্তিটা কেটে গেল যখন ডাক্তারের কথা মনে পড়লো। হুড়মুড় করে উঠে গেলেন। দেখলেন ঠিক ৫টা বাজে। 'এপয়েন্টমেন্ট' ৫.৩৫ মিনিটে। আধা ঘন্টার উপর সময় আছে।

শাফকাত সাহেব থাকেন 'নিকুঞ্জে' বাসা ভাড়া করে। তিনি উঠে তাড়াতাড়ি করে শার্টপ্যান্ট পরে বাসা থেকে বেরিয়ে গেলেন। মেট্রোরেলের স্টেশনটা ভাগ্যিস বাসার কাছেই। একটু দ্রুত হেঁটে তিনি পৌঁছে গেলেন পাঁচ মিনিটের মধ্যেই। ঘড়িতে তখন ৫টা বেজে ১৫ মিনিট। স্টেশনে পৌঁছার এক মিনিটের মধ্যে মেট্রোরেল এসে পৌঁছালো। দশ মিনিটে অর্থাৎ ৫টা ২৬ মিনিটে তিনি আগারগাঁও স্টেশনে এসে নামলেন। এখানেই তাঁর হাসপাতাল, পায়ে হাঁটা পথ। তিনি দ্রুত হেঁটে হাসপাতালে ঢুকে ডাক্তারের চেম্বারের কাছে পৌঁছালেন। ঘড়িতে দেখলেন ৫টা ৩১ মিনিট। ডিজিটাল বোর্ডে তাকিয়ে দেখেন ২২ নম্বর সিরিয়েল জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন শাফকাত সাহেব। তাঁর সিরিয়েল নম্বর ২৩। চার মিনিট হাতে আছে। তাই একটি চেয়ারে নিশ্চিতে বসে পড়লেন। ঠিক চার মিনিট পর ভেসে উঠল ২৩ নম্বর সিরিয়েল। তিনি উঠে এগিয়ে গেলেন চেম্বারের দিকে। ডাক্তারকে সালাম দিয়ে ঢুকতে যাবেন, ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ করে চিৎকার দিয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। জয়া কাছেই ছিল, দৌড়ে এল। জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার? স্বপ্ন দেখছিলে? শাফকাত সাহেব কিছু বললেন না। উঠে বসে জানতে চাইলেন, ক'টা বাজে। জয়া বলল ৬টা । শাফকাত সাহেব বললেন, আমাকে এককাপ চা বানিয়ে দাও। আমার তো ডাক্তার আছে সেই আগারগাঁয়ে।

চা খেয়ে শাফকাত সাহেব বেরিয়ে পড়লেন। রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে রইলেন একটি সিএনজির জন্য। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সিএনজির দেখা না পেয়ে সামনে মেইন রোড পর্যন্ত হেঁটে গেলেন। প্রথম সিএনজিটি যেতে রাজী হল না। দ্বিতীয়টি সম্মত হলে তাতে চেপে বসলেন। সিএনজি ছুটে চলল। শাফকাত সাহেব ভাবতে লাগলেন, ডাক্তার তো সময় দিয়েছে সাড়ে আটটায়। কিন্তু ক'টায় যে দেখবেন আর ক'টায় যে বাসায় ফিরতে পারবেন কে জানে। কিছু তো করার নেই। সেইসংগে মনে পড়তে লাগল কিছুক্ষণ আগে দেখা স্বপ্নের কথা। কি দেখলেন এটা? আবার ভাবলেন তিনি তো অমূলক কিছু দেখেন নি। এদিন আসতে আমাদের দেশে তো বেশিদিন লাগবে না যখন আমরা সময় মেনে যাতায়াত করতে পারব, সময় মেনে আমাদের ডাক্তার সাহেবরা রোগীও দেখবেন। আশায় বুক বেঁধে রইলেন শাফকাত সাহেব।

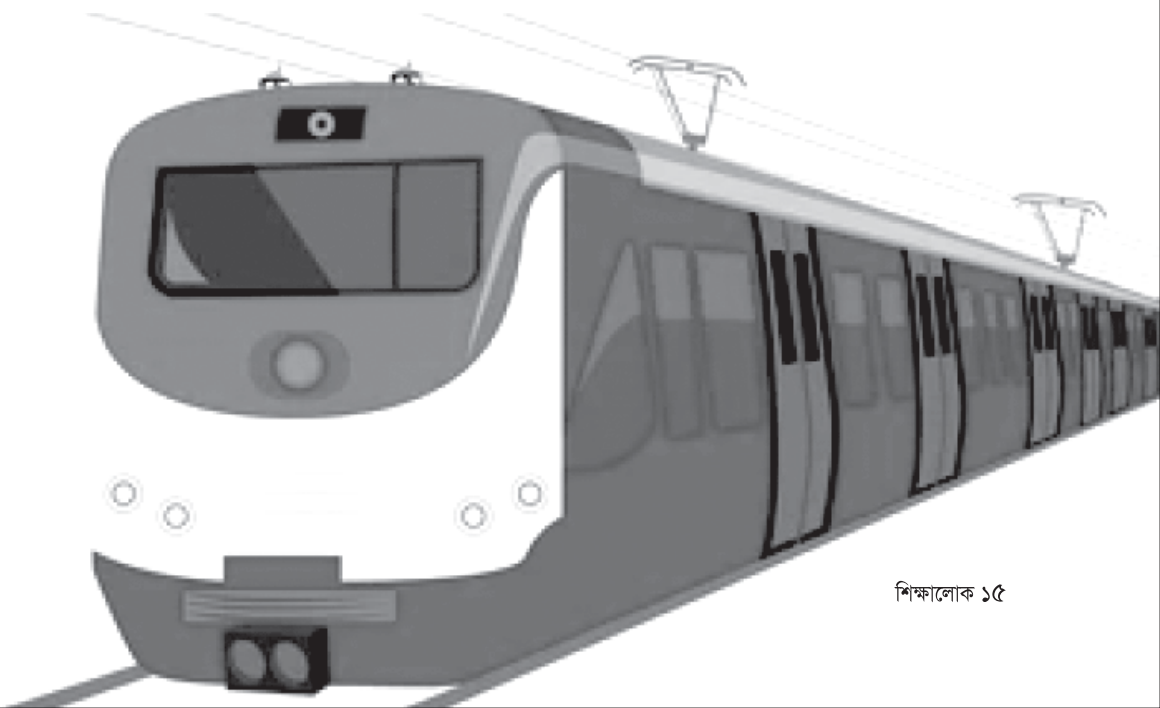

## অদ্বৈত মেলা ২০২৩এ সিদীপের পক্ষে

# ‘মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারে’র অংশগ্রহণ

তিতাস বিধৌত ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কৃতি সন্তান, ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসের অমর কথাশিল্পী অদ্বৈত মল্ল বর্মণের জন্মদিন উপলক্ষে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ‘তিতাস আবৃত্তি সংগঠন’ গত ১-৩ জানুয়ারি শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ভাষা চত্বরে আয়োজন করে তিনদিনব্যাপি অদ্বৈত মেলা-২০২৩। অদ্বৈতের সৃষ্টি নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি মেলা নানান সাংস্কৃতিক আয়োজন দিয়ে সাজানো হয়। তারমধ্যে লোকজ সঙ্গীত, নৃত্য ও দেশ-বিদেশের আবৃত্তিশিল্পীগণের কবিতা আবৃত্তি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও মেলায় সিদীপের পাশাপাশি শিশু একাডেমি ও প্রকৃতি প্রকাশনীর বইয়ের স্টলসহ আরও নানান ধরনের স্টল ছিল। তিনদিনব্যাপি মেলাপ্রাঙ্গণ বরেণ্য কবি, লেখক, ছড়াকারসহ স্থানীয় রাজনীতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংগঠকদের পদচারণায় মুখরিত ছিল। উল্লেখ্য তিতাস আবৃত্তি সংগঠন ২০১৩ সাল থেকে অমর এই কথাশিল্পীর জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর স্মরণে এ মেলা আয়োজন করে থাকে। সিদীপের পক্ষ থেকে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারও একটি বইয়ের স্টল দিয়ে অদ্বৈত মেলায় অংশগ্রহণ করে।

# শজনে ও তালচাষ সম্প্রসারণ বিষয়ক জুম মিটিং

১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩এ সিদীপের শিক্ষা সুপারভাইজারদের নিয়ে তালগাছ ও শজনে চাষ সম্প্রসারণ বিষয়ক একটি জুম মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। গত জুলাই মাস থেকে সিদীপের ১৭টি শাখায় পরীক্ষামূলকভাবে তালগাছ ও শজনে চাষ সম্প্রসারণ বিষয়ে আমাদের শিক্ষা সুপারভাইজাররা কাজ করছেন। আরও ১৮টি শাখার শিক্ষাসুপারভাইজারসহ মোট ৩৫ জন শিক্ষাসুপারভাইজারদের নিয়ে তাল ও শজনের পুষ্টিগুণ, উপকারিতা এবং তাল ও শজনে চাষের সমস্যা-সম্ভাবনা ও পরামর্শ নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।

## শতবর্ষী বিদ্যালয়

# সরাইল অন্নদা উচ্চ বিদ্যালয়ের কথা

### জুয়েল ঠাকুর

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা বাংলাদেশের অন্যতম জেলা। যাকে বলা হয় বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক রাজধানী। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা হওয়ার আগেই সরাইল পরগণার জন্ম। এ পরগণায় জন্ম নিয়েছেন বাংলাদেশের বহু বিখ্যাত ব্যক্তি।

১৭৯৩ সালে যখন সরাইল পরগণা প্রতিষ্ঠা হয় তার কিছুদিন পর ১৮০২ সালে ময়মনসিংহের সেরেস্তাদার বাবু জগবন্ধু রায় খুব অল্প দামে সরাইলের ৫ আনা ১২ গন্ডা দেওয়ানি নিলামে ক্রয় করেন। তিনি ছিলেন অন্নদা প্রসাদ রায়ের দাদা। বাবু অন্নদা প্রসাদ রায় ছিলেন খুবই শিক্ষানুরাগী। তিনি ১৮৭১ সালে সরাইল অন্নদা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৮৭৫ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সদরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া অন্নদা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে এটা সরাইল এম ই স্কুল নামে যাত্রা শুরু করে।

বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন প্রধানশিক্ষক ছিলেন বাবু নবীনচন্দ্র ভট্টাচার্য। তিনি ১৮৭১ থেকে ১৮৭৩ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। তারপর ১৮৯৩ সালে সরাইল অন্নদা উচ্চ বিদ্যালয় হিসেবে পথ চলা শুরু করে। উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধানশিক্ষক ছিলেন বাবু হরকুমার ভট্টাচার্য, তিনি ১৮৯৩ থেকে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। তারপর স্কুলটি ১৯৮৬ সালে সরকারিকরণ হয়। সরকারিকরণের পর জনাব মো. নুরুল হক প্রধানশিক্ষক হিসেবে ১৯৮৬ থেকে ১৯৯৩ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। আমি মো. নুরুল হক স্যারের সময়ে স্কুলে ভর্তি হই এবং ১৯৯২ সালে এসএসসিতে ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হই। সে সময়টা হয়তো সরাইল অন্নদা স্কুলের স্বর্ণযুগ। কারণ তখন ছেলেরা পড়ালেখা নিয়ে ব্যস্ত থাকতো। শিক্ষকরা আমাদের খুবই যত্ন সহকারে পড়াতেন। আমার সময়গুলা কেটেছে প্রমথ স্যার, আমিনুল স্যার, মোহীনি স্যার, ওহাব স্যার, সিরাজ স্যারদের সান্নিধ্যে। আমরা সবসময় তাদের ভয়ে ভীত ছিলাম, পড়া না পারলে বেতের বাড়ি। এ স্কুলে পড়ে অনেকেই দেশের বিভিন্ন সেক্টরে বড় বড় পদে দায়িত্ব পালন করছেন। আমাদের সময়ে স্কুলটি "ই" আকৃতির বিল্ডিং ছিল। এখনো তা-ই আছে। তারপর উত্তরে তিনতলা ভবন নির্মাণের কাজ চলছিল। এখন সেটাও সম্পন্ন।

এখানে উল্লেখ্য যে, একটা সময় সরাইল পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের মেয়েরা নবম শ্রেণিতে অন্নদা স্কুলে ভর্তি হতেন এবং এ স্কুল থেকে এসএসসি পরীক্ষা দিতেন। ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজের চেয়াম্যান প্রীতি চক্রবর্ত্তী সরাইল অন্নদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী। এ সময় এটা ভাবলে কেমন জানি মনে হয়, মেয়েরা আবার বয়েজ স্কুলের ছাত্রী হয় কিভাবে! সরাইল অন্নদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সবচাইতে বেশি সময় ধরে প্রধানশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় বাবু হেমেন্দ্র চন্দ্র রায়। তিনি ১৯৫২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে সরাইল অন্নদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন জনাব কাজী শহিদুল ইসলাম। তিনি ১১ জুন ২০২২ থেকে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

আমি এ স্কুলের একজন ছাত্র এবং বাংলাদেশের একটি প্রাচীন বিদ্যাপিঠ হিসেবে এ স্কুলের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।

*লেখক: সাবেক শিক্ষার্থী, ১৯৯২ ব্যাচ।*

# রাখি খাতুনের সফলতার গল্প

মো. জাহিদ হাসান

কঠিন বাস্তবতার মুখে পড়ে এক সময় চারিদিক অন্ধকার দেখছিলেন রাখি খাতুন। স্বামী মো. শহিদুল ইসলাম একার আয়ের সংসার চালাতে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় শহিদুল ইসলাম নিজ জমিতে চাষ করেও তেমন আয় করতে পারতেন না। সামাজিক দিক দিয়েও রাখি খাতুন অনেকাংশেই পিছিয়ে ছিলেন। কিন্তু যতদিন যায় ততই রাখি খাতুনের সংসারে চাহিদা বাড়তে থাকে। এমতাবস্থায় রাখি খাতুন স্বামীর পাশাপাশি নিজে সংসারটাকে স্বচ্ছল রাখার জন্য হাঁস-মুরগি এবং ছাগল পালন শুরু করেন। রাখি খাতুন পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলায় দাশুড়িয়া ইউনিয়নে কালিকাপুর গ্রামের অধিবাসী।

রাখি খাতুনের সংসারে এক ছেলে ও এক মেয়ে। তার ছেলে হৃদয় ৯ম শ্রেণীতে পড়ে ও মেয়ে সুমাইয়া তৃতীয় শ্রেণীতে লেখাপড়া করে। অভাব অনটনের মধ্যে দিয়ে তাদের দিন কাটছিল। রাখি খাতুন ভাবতে থাকেন কি করবেন। তখন তার প্রতিবেশীদের সাথে কথা বলে জানতে পারেন সিদীপ নামে একটি এনজিওতে সাপ্তাহিক, মাসিক এবং এসএমএপি কৃষিঋণ প্রদান করা হয়। রাখি খাতুন তার স্বামীর সাথে পরামর্শ করেন এবং ঠিক করেন সিদীপের দেবোত্তর শাখায় কালিকাপুর মহিলা সমিতিতে ভর্তি হবেন। সমিতির সদস্য হওয়ার পর কয়েক মাস তিনি কেবলমাত্র সাপ্তাহিকভাবে সঞ্চয় করতে থাকেন। এরপর ২০২০এর ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৬,০০০ টাকা সাপ্তাহিক ঋণ গ্রহণ করেন। এরপর রাখি খাতুন প্রথম বারের মত এসএমএপি কৃষি ঋণ নেন ২০,০০০ টাকা ২০২০এর ২০ নভেম্বর।

আবারও তিনি ৫০,০০০ টাকা এবং ২০,০০০ টাকা সাপ্তাহিক ঋণ নেন। এবার তিনি ৩৩ শতাংশ জমিতে শিম চাষ করেছেন। কিন্তু শিম চাষ করে এবার রাখি খাতুন মাত্র ১৫,০০০ টাকা আয় করেন।

এছাড়াও রাখি খাতুনের ২টি গাভী এবং ১টি ষাঁড় গরু আছে। দুইটি গাভী থেকে প্রতিদিন ৩০-৩৫ লিটার দুধ পান। যার বাজার মূল্য হিসেবে প্রতি লিটার ৫৫-৬০ টাকা করে প্রতিদিন তিনি ১৬৫০ থেকে ২১০০ টাকা আয় করেন। এভাবে প্রতি মাসে তার শুধুমাত্র দুধ বিক্রয় করে ৪৯,৫০০ থেকে ৬৩,০০০ টাকা আয় হয়। তন্মধ্যে তার মাসিক খরচ গড়ে আনুমানিক ২০,০০০ থেকে ২৫০০০ টাকা। অর্থাৎ রাখি খাতুনের মাসিক আয় বর্তমানে ২৯,০০০ থেকে ৪০,০০০ টাকা প্রায়। রাখি খাতুন আরও বলেন তার পোষা ষাঁড় গরুটি আগামী রমজান মাসে আনুমানিক ১,৫০,০০০ থেকে ২,০০,০০০ টাকায় বিক্রয় হতে পারে, লাভ হবে প্রায় ১,০০,০০০ টাকা।

রাখি খাতুন তার অভিজ্ঞতা তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, কাজকে কোন সময় ছোট করে না দেখে অধ্যবসায় দ্বারা পরিশ্রম করলে তার সফলতা একদিন আসবেই।

লেখক: সিদীপের উপসহকারী কৃষিকর্মকর্তা, পাবনা জোন।

# মালেকা বেগমের ঘুরে দাঁড়ানো

কিশোর কুমার

সংসারে অভাব অনটন লেগেই থাকত মালেকা বেগম ও আমির হোসেনের। যদিও ৭০ শতাংশ জমি আমির হোসেনের আছে কিন্তু টাকার অভাবে জমিতে ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হত না। তাই তার স্বামী প্রায় সারা বছরই অন্যের জমিতে শ্রম বিক্রি করেন এবং অল্প কিছুদিন নিজের জমিতে কাজ করেন। এভাবেই চলে মালেকা বেগম ও আমির হোসেনের সংসার।

মালেকা বেগমের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ জন। স্বামী-স্ত্রী ও ২ জন ছেলে এবং ১ জন মেয়ে। দারিদ্র্যের কারণে দিনরাত স্বামী-স্ত্রী দুজনে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করার পরও সংসারের অভাব দূর হয় না মালেকা বেগমের। পাড়া-প্রতিবেশীর নিকট থেকে মালেকা বেগম জানতে পারেন যে, সিদীপ নামে একটি সংস্থা আছে এবং সংস্থাটি দরিদ্র পরিবারের লোকদের বিভিন্ন ধরনের ঋণ দিয়ে থাকে যার কিস্তি প্রতি মাসে বা সপ্তাহে পরিশোধ করতে হয়। এছাড়া আরও এক ধরনের ঋণ দেয়া হয় যার কিস্তি এককালীন অর্থাৎ ৬ মাসে এবং মেয়াদ অনুযায়ী

মালেকা বেগমের কাজে সফলতা দেখে এলাকার অন্য লোকজনও কৃষি কাজের প্রতি উৎসাহিত হয়েছেন এবং তার কাছে থেকে পরামর্শ নিচ্ছেন। মালেকা বেগমও পরামর্শ দিতে পেরে অনেক খুশি এবং সর্বোপরি সিদীপের প্রতিও তিনি কৃতজ্ঞ

পরিশোধ করতে হয়। এককালীন পরিশোধের এ বিষয়টি মালেকা বেগমের খুব ভাল লাগে এবং তার মধ্যে এ ঋণ নেওয়ার আগ্রহ জাগে। যেহেতু মাসিক বা সাপ্তাহিক কোন কিস্তি নেই, তাই এ ঋণ নিয়ে কোন কাজ করে এককালীন ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব। এ বিষয়টি মালেকা বেগম তার স্বামীর সাথে আলোচনা করেন। ঋণের টাকা দিয়ে তাদের নিজের জমির পাশাপাশি অন্যের জমি বর্গা নিয়ে সবজি চাষ করে লাভের টাকা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব এবং লাভবান হওয়া সম্ভব বলে মালেকা বেগম তার স্বামীকে জানান। মালেকা বেগমের চিন্তাভাবনা বাস্তবসম্মত বলে আমির হোসেন রাজি হন এবং সিদীপ থেকে ঋণ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন।

তারপর মালেকা বেগম সিদীপের সদস্যদের মাধ্যমে সিদীপের সদস্যপদ লাভ করেন এবং এক মাস পর টমেটো চাষ প্রকল্পে মুন্সিগঞ্জ ব্রাঞ্চ থেকে ৪০,০০০ টাকা ঋণ প্রস্তাব করেন। প্রস্তাব অনুযায়ী তার ঋণ মঞ্জুর হয় এবং ঋণের টাকা দিয়ে তিনি তার জমিতে শিম, লাউ, ঝিঙ্গা, ঢেঁড়স, টমেটো এবং ধান চাষ করেন। ৬ মাসে মালেকা বেগম সব সবজি মিলিয়ে প্রায় ৮০,০০০ টাকার সবজি বিক্রয় করেন এবং আন্যান্য সব খরচ বাদ দিয়ে তার লাভ হয় ২০,০০০ টাকা। এই লাভের টাকা দিয়ে তারা আরও ৩০ শতাংশ জমি বন্ধক নেন এবং মালেকা বেগমের স্বামী আমির হোসেন শ্রম বিক্রি বন্ধ করে দেন। মালেকা বেগম এসএমএপি ঋণ গ্রহণের পূর্বে টেকনিক্যাল ওরিয়েন্টেশনের সময় মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়নের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তার সাথে তার পরিচয় হয়। ১০০ শতাংশ জমির মধ্যে ৭০ শতাংশ জমিতে তিনি চক্রাকার পদ্ধতিতে সবজি চাষ শুরু করেন যেন সব সময় তার সবজি খেত থেকে সবজি বিক্রয় করতে পারেন এবং বাকি ৩০ শতাংশ জমিতে ধান চাষ করেন। বর্তমানে মালেকা বেগম তার সবজি খেত থেকে প্রতি সপ্তাহে প্রায় ২০,০০০ টাকার সবজি বিক্রয় করেন। এছাড়া তার ধান ফসলের অবস্থাও ভাল এবং এই ফসলের কোন সমস্যা বা রোগবালাই হচ্ছে কিনা তা দেখতে সিদীপ ও মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন।

মালেকা বেগম বলেন, এই ফসল উৎপাদন করতে তার জমি, সার, জমিচাষ, সেচ, নিড়ানি ও কর্তন বাবদ প্রায় ১৫,০০০ ও ১৮,০০০ টাকা খরচ হবে। বর্তমানে ফসল যে অবস্থায় আছে তাতে এ ফসল বিক্রয় করে প্রায় ৬০,০০০ থেকে ৭০,০০০ টাকা পাওয়া যাবে। মালেকা বেগম ও তার স্বামী আমির হোসেন জানান, ধান চাষ করে এক মৌসুমে প্রায় ৩০,০০০ থেকে ৩৫,০০০ টাকা লাভ করা সম্ভব। মালেকা বেগম সবজি চাষের পাশাপাশি গাভী পালনেও আগ্রহী হন এবং একটি গাভী ক্রয় করেন। এক বছর পর ঐ গাভী থেকে দৈনিক ১৫ লিটার দুধ পান এবং তা বাজারে বিক্রয় করে প্রায় ৮০০ টাকা পান। সেই টাকা থেকে কিছু জমিয়ে আরও একটি গাভী ক্রয় করেন। মালেকা বেগম বলেন যে, প্রতি বছর তারা পর্যায়ক্রমে আরও বেশি জমিতে সবজি ও ধান চাষ করবেন। মালেকা বেগমের কাজে সফলতা দেখে এলাকার অন্য লোকজনও কৃষি কাজের প্রতি উৎসাহিত হয়েছেন এবং তার কাছে থেকে পরামর্শ নিচ্ছেন। মালেকা বেগমও পরামর্শ দিতে পেরে অনেক খুশি এবং সর্বোপরি সিদীপের প্রতিও তিন কৃতজ্ঞ।

*লেখক: সিদীপের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, ঢাকা জোন।*

# বিশ্বব্যাপী বায়ুর মানের উপর
# কোভিড-১৯ অতিমারির প্রভাব

মাহবুবুর রশীদ অরিস

বিশ্বের প্রতিটি জীবন্ত প্রাণী প্রতিনিয়ত বায়ু দূষণের মাধ্যমে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। সমগ্র বিশ্ব জুড়েই আধুনিকায়ন ও শিল্পবিপ্লবের প্রভাব বায়ু দূষণকে ক্রমাগতভাবে বিপজ্জনক মাত্রায় ধাবিত করছে। বায়ু দূষণের ফলে দূষক পদার্থের নির্গমন যেমন পার্টিকুলেট ম্যাটার (PM), সালফার অক্সাইড (SOx), নাইট্রোজেন অক্সাইড (NOx), কার্বন মনোক্সাইড (CO) এবং কার্বন ডাই অক্সাইড (CO2) ইত্যাদি নির্গত হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) তথ্যমতে ৪.২ মিলিয়ন মানুষ প্রতি বছর বায়ু দূষণের প্রভাবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রাণ হারায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কোভিড-১৯ রোগের কথা ১১ই ফেব্রুয়ারি ২০২০এ মানুষের সামনে প্রকাশ করে। অতঃপর, মৃত্যুহার এবং আক্রান্তের হার কমাতে ২০২০ সালে সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার বিভিন্ন স্থানে লকডাউন কৌশল গ্রহণ করে। কোভিড-১৯এর জন্য সংঘটিত লকডাউন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণ, শক্তি খরচ এবং তেলের চাহিদা ইত্যাদি হ্রাস করে। ন্যাশনাল এরোনটিক্স এণ্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (নাসা) এবং ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থা (ইএসএ)'র তথ্য অনুসারে করোনাকালে নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড নির্গমন ৩০% পর্যন্ত কমেছে এবং পরিবেশের মান উন্নত হয়েছে। কোভিড-১৯ অতিমারি বিশ্বের বায়ুমানের ওপর একটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল, যার ফলে শিল্পকলখানা থেকে ক্ষতিকর বায়ু নির্গমন হ্রাস, আবহাওয়ার ধরনের পরিবর্তন এবং অনেক ক্ষেত্রে বায়ুর মানের উন্নতি ঘটে।

চীনের বায়ুমণ্ডলে ৩০% কম নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড নির্গত হয়েছে, যেখানে ভারতে শিল্প এবং পরিবহন থেকে কম নির্গমন সত্ত্বেও দাবানল এবং কৃষিক্ষেত্রে জমি পোড়ানোর পরিমাণ বাড়ে। স্থানীয়

| স্থান | এজেন্সি | স্যাটেলাইট | সময় | মাত্রার হ্রাস | উৎস |
|---|---|---|---|---|---|
| উহান | ইসা এবং ইএসএ | অরা এবং স্যান্টিন্যাল-৫পি | জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি (২০১৯ এবং ২০২০) | ৩০% | (নাসা, ২০২০) |
| চীন | ইএসএ | স্যান্টিন্যাল-৫পি | জানুয়ারি এবং-ফেব্রুয়ারি ২০২০ | ২০-৩০% | (ইএসএ, ২০২০) |
| ইউরোপ | ইএসএ | স্যান্টিন্যাল-৫পি | মার্চ ২০১৯ এবং মার্চ ২০২০ | ২০-৩০% | (ইএসএ, ২০২০) |
| ইটালি | ইএসএ | স্যান্টিন্যাল-৫পি | মার্চ ২০১৯ এবংমার্চ ২০২০ | ২০-৩০% | (ইএসএ, ২০২০) |
| ফ্রান্স | ইএসএ | স্যান্টিন্যাল-৫পি | মার্চ ২০১৯ এবং মার্চ ২০২০ | ২০-৩০% | (ইএসএ, ২০২০) |
| স্পেন | ইএসএ | স্যান্টিন্যাল-৫পি | মার্চ ২০১৯ এবং মার্চ ২০২০ | ২০-৩০% | (ইএসএ, ২০২০) |
| আমেরিকা | ইএসএ | অরা | মার্চ ২০১৫-১৯ এবং মার্চ ২০২০ | ৩০% | (নাসা, ২০২০) |

*বিভিন্ন স্থানে নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইডের নির্গমনের ওপর তথ্য (মুহাম্মদ, লং ও সালমান, ২০২০)*

দূষণের উৎস, আবহাওয়া সংক্রান্ত প্রবণতা এবং অতিমারির প্রভাবে লকডাউন পদ্ধতিগুলি বায়ুমানের পরিবর্তনে অবদান রাখে, যার ফলে সামগ্রিকভাবে বিশ্বের অনেক অঞ্চলে বায়ুর গুণমান উন্নত হয়। দূষণ হ্রাস করা এবং প্রকৃতিকে তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য কোভিড-১৯এর বিশ্বব্যাপী আতিমারী একটি 'ছদ্মবেশে আশীর্বাদ' হিসেবে ব্যক্ত হয়। সরকার এবং নাগরিকদেও একইভাবে এটি পরিকল্পনার আওতায় আনা উচিত এবং দীর্ঘমেয়াদী দূষণ প্রতিরোধের কৌশলগুলি অবলম্বন করা উচিত। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে অর্থনৈতিক ক্ষতি কমাতে এবং বায়ুর গুণমান উন্নত করতে দূষিত শহরগুলির রাষ্ট্রসমূহের সরকার করোনাকালে নেয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ থেকে গৃহীত কোনো কোনো শিক্ষা আংশিকভাবে প্রয়োগ করতে পারে।

*লেখক: ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনী, সিদীপ*

# নৈতিক চেতনা জাগ্রত হোক

## মাহ্‌ফুজ সালাম

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব তা কে অস্বীকার করবে? অর্থাৎ মানুষের মাঝে এমন কিছু বিশেষ গুণ রয়েছে যা অন্য কোন প্রাণির মধ্যে নেই। মানুষই একমাত্র প্রাণি যে বিবেক, বুদ্ধি, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়ে ভাল এবং মন্দের প্রভেদ করতে পারে।

আবার এই মানুষের ভিতরেই রয়েছে পশুত্ব, নেগেটিভ শক্তি। ঠিক মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠের মতো। যা কেটে ছেঁটে ফেলার উপায় নেই। তাই মানুষ যখন মনুষ্যত্ব ও বিবেক-বুদ্ধি হারায় তখন তাকে আমরা পশু ভাবি। এ কারণেই হয়ত কেউ কেউ বলে মানুষ এক রহস্যময় প্রাণি। তার ভিতর এবং বাহিরের রূপ এক নয়। আমরা প্রতিনিয়ত মানুষের বাহারি রূপের দেখা পাই। কখনও প্রকাশ্যে কখনও অপ্রকাশ্যে। কখনও দয়াদাক্ষিণ্যে, কখনও হিংস্রতা বা নিষ্ঠুরতায়।

আমরা প্রাণিদের মধ্যেও ভক্তি, মায়া ও কৃতজ্ঞতাবোধ লক্ষ্য করি। তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ দেখি কুকুর, বিড়াল, গরু, গাধা, মোষ, ভেড়া, ঘোড়া ও হাতি প্রভৃতি প্রাণীর মধ্যে। মানুষের মধ্যেও শ্রদ্ধা, ভক্তি, দয়া, মায়া, প্রেম, ভালবাসা ইত্যাদি রয়েছে। পাশাপাশি এসবের বিপরীতে রয়েছে নির্দয়তা, নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার মতো নেতিবাচক গুণাবলী। তারপরও মানুষই পারে সমাজে শান্তিশৃংখলা সৃষ্টি করতে। আবার এই মানুষই পারে সবকিছুকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যেতে।

যুগে যুগে মানুষের মানবীয় গুণাবলীর বন্দনা করা হয়েছে কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, গান, নাটক, শিল্পকর্ম ইত্যাদিতে। যা আছে ভিতরে তার সঠিক বিকাশ এবং উৎকর্ষ সাধন হলেই বাইরে প্রতিফলিত হবে তার প্রকৃত রূপ। এই যে মায়ের পেট থেকে মাটিতে পড়ে মানুষ পা-পা করে এগিয়ে যাচ্ছে পূর্ণতার দিকে সে পূর্ণতা নৈতিকতার, পশুত্বকে তাড়িয়ে মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধন করার।

ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রের সর্বত্র শান্তি, শৃংখলা ও জীবনের নিরাপত্তার জন্য এই নৈতিকতাই পারে মানুষের শুভবুদ্ধি ও সম্প্রীতিবোধকে সুরক্ষা করতে, বিভেদ ও বৈষম্যকে কমিয়ে আনতে। যে মানুষ নৈতিক বোধসম্পন্ন তার কাছ থেকে মানুষ কখনও বিড়ম্বিত হবে না। স্বার্থ, বিত্ত-বৈভব কোন কিছুই তাকে টলাতে পারে না। পাহাড়ের মতো অবিচল থেকে সামনের দিকে পথ চলতে তাকে সাহায্য করে এই নৈতিকতা। সেটা হতে পারে একজন নিরক্ষর অতি সাধারণ মানুষের বেলায়ও। তাহলে এ সিদ্ধান্তে আসা যায়–আজ বড় প্রয়োজন দয়া-মায়া, স্নেহ-মমতা, প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা, সহানুভূতি ও সহমর্মিতার। কারণ এসবের ভিতরেই আছে মানুষের নৈতিকতাবোধের অগ্নিশিখা। অন্যদিকে নৈতিকতাবর্জিত সমাজে ব্যক্তি স্বার্থের হানাহানি, কাটাকাটি, মারামারি, হিংসা-বিদ্বেষ, দলাদলি, পরশ্রীকাতরতা ও সম্মানহানির বীভৎসতা। সামাজিক নিরাপত্তার সাথে নৈতিকতার সম্পর্কটা নিবিড় এবং গভীর। আমরা এখন নৈতিকবোধহীনতার শিকার। নৈতিকতাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দিতে বসেছি।

এমন একটা সময় পার করছি যেখানে কোন নীতিনৈতিকতা ও মনুষ্যত্বের বালাই নাই। চারদিকে খাই খাই, আরও চাই, আরও চাই, যেন লুটপাটের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হবার প্রয়াস। যে যেভাবে পারে অপরকে ঠকিয়ে সুখের পাহাড় গড়বার স্বপ্নে বিভোর। তার যেন বিরাম নেই। একটা সময় ব্যবসয়ীদের মধ্যে সততা ছিল। এখন একই জায়গায় একই পণ্যের তিন রকম দাম। ক্রেতারা বিভ্রান্ত। তেলে ভেজাল, জলে ভেজাল, মাছ-মাংসে ভেজাল, শিশুর খাবারে ভেজাল। সর্বত্র মুনাফা-মজুতদারি, শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা, মানুষ নিয়ে ব্যবসা। মানুষ চলে যাচ্ছে সাগরের লোনা জলে, হাঙ্গরের পেটে।

আমাদের চারপাশে এই যে কত সুন্দর পৃথিবী, কী নেই এখানে? পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আল কোরআনের সুরা আল আম্বিয়ায় বলা হয়েছে ‘আর তিনি রাত এবং দিন, সূর্য ও চাঁদ সৃষ্টি করেছেন; সবাই নিজ নিজ কক্ষ পথে বিচরণ করে।’ (সুরা আল আম্বিয়া-৩৩)। সুরা আর রাহমানে বলা হয়েছে ‘তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন মানদণ্ড, যাতে ভারসাম্য লংঙ্ঘন করা না হয়, ওজনের ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠিত কর এবং মাপে কম দিও না, তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করেছেন সৃষ্ট জীবের জন্য এবং খোসাবিশিষ্ট দানা ও সুগন্ধ গুল্ম। পৃথিবী বহু শাখাপল্লব বিশিষ্ট বৃক্ষে পরিপূর্ণ, সেখানে রয়েছে ফলমূল, খেজুর ও আনার। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে।’

নৈতিকতা বিবর্জিত সমাজে মানুষ হয়ে উঠছে অপরাধ-প্রবণ। ভাই দাঁড়াচ্ছে ভাইয়ের বিরুদ্ধে, মৌলানা দাঁড়োচ্ছে মৌলানার বিরুদ্ধে, বাবা দাঁড়াচ্ছে সন্তানের বিরুদ্ধে। দুর্নীতি, কালো টাকা, ঘুষ, স্বজনপ্রীতি, খুন, রাহাজানি, ধর্ষণ, ব্যক্তিকেন্দ্রীক উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ভোগবাদী লালসায় আত্মমগ্ন করে তুলছে সমাজের মানুষকে।

আজকাল ব্যবসায়ীরা কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে কোটি কোটি টাকার মালিক হচ্ছে। খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠছে। রোজা, ঈদ, পূজায় জিনিসের দাম হাতের নাগালে বাইরে চলে যায়। খাবারে বিষ মিশায়ে মুনাফা লুটছে এক শ্রেণি। একজন মানুষের কিংবা একটি পরিবারের বেঁচে থাকার জন্য কত সম্পদ প্রয়োজন? যারা শত মানুষের সম্পদ লুট করে সম্পদের পাহাড় গড়ায় ব্যস্ত তারা কি এসব কবরে নিয়ে যেতে পারবেন? বিশ্ববিজয়ী আলেকজান্ডার দি গ্রেট তার সেনাপতিকে বলেছিলেন তার মৃত্যুর পর কফিনে তার হাত দুটো খোলা রাখার জন্য আর শবযাত্রায় রাস্তায় স্বর্ণ ছিটিয়ে রাখার জন্য। মানুষ যেন দেখে শিখে আলেকডান্ডার এতকিছু করেও কিছুই নিয়ে যেতে পারেননি। তাকে খালি হতে চলে যেতে হচ্ছে।

আজ আমরা হারাচ্ছি মনুষ্যত্ব। এ কারণে মানবতার জয়গানের জন্য নৈতিকতার আজ খুব বেশি প্রয়োজন। বিবেককে জাগ্রত করতে হবে আমাদের।

*লেখক: ছড়াকার ও সমাজকর্মী*

# সভ্যতা, শিক্ষা ও নৈতিকতা

মো. মাহবুব হোসেন

আমরা আধুনিক যুগের বাসিন্দা। বলা চলে সভ্যতার চূড়ায় অবস্থান করছি আমরা। আধুনিক সকল সুযোগসুবিধা আমাদের হাতে। দূর প্রবাসে হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থান করা প্রিয় মুখটির সঙ্গে আমরা মুহূর্তেই ভিডিও কলে কথা বলছি। আবার হাতে থাকা ডিভাইসে একটা ক্লিক করলেই রেডি খাবার, পছন্দের পোশাক-আশাক, আসবাবপত্র ইত্যাদি আমাদের আঙিনায় এসে হাজির হচ্ছে। অবারিত এই সুযোগ, যা একটা সময় ছিল কল্পনারও অতীত।

ভাবুনতো, আদিম যুগে কিভাবে দিনাতিপাত করেছে আমাদের পূর্বপুরুষেরা। তারা কাঁচা মাংস ভক্ষণ করত, গাছের ছাল-বাকল পরিধান করত, আর বন্য পশুদের সঙ্গে লড়াই করে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখত। তাদের ছিল না কোনো ঘর–তাই হিংস্র বন্য জীবজন্তুর হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য মানুষ পাহাড় কেটে গুহা তৈরি করল। গুহা থেকে গৃহ তৈরির ভাবনা শুরু।

ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে মানুষ সভ্য জীবনের ধারণা পেল। আর আগুন জ্বালানোর মাধ্যমেই সভ্যতার সূচনা। আমাদের চিন্তা-কল্পনা এবং প্রত্যাশায় নতুন নতুন ডালপালা মেলতে শুরু করল। আমরা শুধু খাবার খেয়ে এখন পরিতৃপ্ত নই, রুচিতে এসেছে বৈচিত্র্য; খাদ্য তালিকায় এখন শতশত ব্যঞ্জন। শুধু পোশাক দিয়ে শরীর ঢাকলেই চলে না, এখানেও আমাদের রয়েছে নতুন চিন্তা, কল্পনা আর রুচির ছাপ। এক দশক বা দুই দশক আগেও যা ছিল আমাদের কাছে কল্পতুল্য, আজকে তা বাস্তবে পরিণত। হাজার হাজার মাইল দূরে থেকে অনলাইনের মাধ্যমে মানুষ দাপ্তরিক কাজ সম্পন্ন করতে পারছে। আমার বাড়িতে, কর্মস্থলে বাব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে কে কী করছে, সিসিটিভি ফুটেজের মাধ্যমে সেটাও দেখা সম্ভব হচ্ছে দূর-দূরান্তে বসেই।

ভাবুন তো একবার, আমরা এক রূপকথার রাজ্যে প্রবেশ করলাম, সেখানে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে আয়েশ করে আমি খাই, দাই, ঘুমাই। হঠাৎ ইচ্ছে হলো আমার পছন্দের কোনো বাংলাখাবার, চাইনিজফুড, থাইফুড বা ইটালিয়ান কোনো রেসিপি খেতে। কিছুক্ষণ পরে সেটা আমার সামনে চলে আসলো। আবার মনে হলো, আমি বিশেষ কোনো পোশাক পরতে চাই, সেটিও আমার সামনে। কিংবা হঠাৎ প্রিয় কোনো মানুষের কথা মনে পড়ল–তার সঙ্গে যদি একটু দেখা করা যেত, কথা বলা যেত! অবাক কাণ্ড–কিছুক্ষণ পরে সেও সামনে এসে উপস্থিত। দাদীনানীদের কাছ থেকে রূপকথার রাজ্যের এমন বর্ণনা আমরা অনেকেই শুনেছি। কিন্তু ২১ শতকে এসে আজকে সবই আমাদের সামনে বাস্তবে রূপ নিয়েছে। আমার-আপনার হাতে থাকা ছোট্ট মোবাইল ডিভাইস দিয়েই এর সবগুলো সাধ মুহূর্তে পূরণ করা সম্ভব। শুধু অনলাইনে অর্ডার করলেই চলে আসছে পছন্দের বস্তু। এসবই সভ্যতার দান।

সভ্যতার অগ্রগতিতে শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষ নতুন নতুন ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে এবং কাঙ্ক্ষিত কল্পরাজ্য আজকে আমাদের করতলে এসে ধরা দিচ্ছে। আমরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম শিক্ষার মাধ্যমেই নতুন নতুন বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছি এবং তা আমাদের জীবনযাত্রায় ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলছে। প্রথমত শিক্ষার মাধ্যমে আমরা একটি সার্টিফিকেট পাচ্ছি, এরপর আমরা চাকরি, ব্যবসায় বা কর্মসংস্থানে সম্পৃক্ত হচ্ছি। এগুলো আমাদের জীবনপ্রবাহের এককেটি ধাপ। আপাতদৃষ্টিতে এগিয়ে যাচ্ছি এভাবেই আমরা।

কিন্তু সভ্যতার এই অগ্রগতি সত্যিই কি আমাদেরকে উৎকর্ষতার দিকে নিয়ে গেছে? গুহা নয়, এখনতো আমরা অট্টালিকার যুগে প্রবেশ করেছি। স্বর্গসম বিশাল বিশাল প্রাসাদ তৈরি করে নিজেরা সুখের সন্ধান করছি। নিঃসন্দেহে অনেক এগিয়ে গিয়েছি আমরা! তবে এত কিছু করেও আমরা কি নিরাপদ হতে পেরেছি? এখন আমাদেরকে আর বন্য জীবজন্তুর হাতে প্রাণ দিতে হয় না। কিন্তু সুবিশাল প্রাসাদে সুরম্য শক্তিশালী কপাট লাগিয়ে স্বামীর হাতে স্ত্রী খুন হচ্ছে কিংবা স্ত্রীর হাতে স্বামী। আদরের সন্তান হত্যা করে বসে নিজের বাবা কিংবা মাকে। সহোদর ভাইটি সম্পদের লোভে বা স্বার্থসিদ্ধির জন্য হত্যা করছে আরেক ভাইকে। তাহলে অবধারিতভাবেই প্রশ্নটি চলে আসে–সভ্যতার এত অর্জনের ফল কি আমরা ভোগ করতে পারছি?

এ প্রেক্ষিতে শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি মনুষ্যত্ব ও নৈতিক মূল্যবোধকে জাগ্রত করা। আমাদের সমাজে আশঙ্কাজনকভাবে মূল্যবোধ ও মনুষ্যত্ববোধের সংকট চলছে। বর্তমানে ভালোমন্দের পার্থক্য বা মূল্যায়ন যথাযথভাবে হচ্ছে না। ব্যক্তিজীবনে সুশিক্ষার প্রভাব অধিকাংশের মধ্যেই পড়ছে বলে মনে হচ্ছে না। আজকে শিক্ষা শুধুই সার্টিফিকেটসর্বস্ব। শুধু আয়েশি জীবন কাটানোর হাতিয়ার যেন এই শিক্ষা। লেখাপড়া শিখে বড় পদে চাকরি করলাম বা অঢেল টাকা উপার্জন করলাম–এটাই এখন শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আবার শিক্ষা বলতে আমরা শুধু অ্যাকাডেমিক শিক্ষাকেই বুঝে থাকি। অর্থাৎ পরীক্ষায় পাশ করে একটি সার্টিফিকেট অর্জন করতে পারলেই শিক্ষিত হওয়ার তকমা গায়ে লেগে যায়। এমন শিক্ষা আমাদের নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন জাতি নির্মাণে খুব একটা কাজে আসছে না।

ভালোমন্দ, সততা-অসততা, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত, করণীয়-বর্জনীয় ইত্যাদি জানাবোঝার প্রাথমিক শিক্ষা মানুষ জন্মের পরে পরিবার থেকেই পেয়ে থাকে। পরিবারে বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদের মধ্যে এসবের চর্চা না থাকলে তোতা পাখির মতো ‘সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা’, কিংবা ‘মিথ্যা

বলা মহাপাপ', 'পরিশ্রম সাফল্যের চাবিকাঠি' এ ধরনের বুলি নবীন প্রজন্মের কাছে নিছক শ্রুতিমধুর বাক্য ছাড়া আর কিছু নয়। এ যেন ধূমপায়ী ডাক্তারের রোগীর প্রতি নির্দেশনা–'ধূমপান করবেন না।' এমন নির্দেশনার প্রতি রোগীর আস্থা কতটুকু থাকতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়।

নৈতিকবোধহীন ছেলে বা মেয়ে ডাক্তার হলেও রোগীর পকেট কাটবে। শিক্ষকতা জীবনে অনেককে দেখেছি, পরীক্ষার হলে সন্তানকে অনৈতিক সুযোগ পাইয়ে দেওয়ার জন্য কতরকম কসরত করতে! আবার অনেক শিক্ষককে দেখেছি ৫০০ টাকার প্রাইভেট টিকিয়ে রাখার স্বার্থে অন্যায় করতে। এ ধরনের অভিভাবক বা শিক্ষক কখনোই সন্তান বা শিক্ষার্থীর কাছে শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারে না।

এবার ঘুরে দাঁড়াবার পালা। অবক্ষয়ের হাত থেকে আমাদের সমাজকে রক্ষা করতে না পারলে সভ্যতার এই অগ্রগতি কোনো কাজেই আসবে না। লোভ আর হিংসার বশবর্তী হয়ে আমরা নিজেরাই পরস্পরের বিনাশের কারণ হবো। কাজটি দুরূহ, তবে অসম্ভব নয়। আগামী প্রজন্মকে সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে উদ্যোগ নিতে হবে নিজ নিজ অবস্থান থেকে। এতে করে একের থেকে দশ, দশের থেকে শতক, শতক থেকে হাজার–এভাবেই আলো ছড়িয়ে পড়বে চারদিকে।

*লেখক: সহকারি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শহীদ নুরুল হোসেন ডিগ্রি কলেজ, কাশীনাথপুর, পাবনা*

# গোধূলি লগ্ন

## তাহমিনা আক্তার ঝুমা

উড়েছে মন
দেখছে ঘুরে ঘুরে দূরের ঐ সুনীল
আকাশ আর দিগন্তের পাহাড় বন।
দু'চোখ ভরে দেখছি ঘুরে
নিঝুম সবুজ দ্বীপে
লাল নীল প্রজাপতিরাও উড়ে
নীল আকাশে লাল সূর্যের ইশারা করেছে সন্ধ্যা
সুন্দর এই গোধূলিতে কি জানি কি
ভেবে যায় মনটা।
পাখিগুলো উড়ে ফিরে চলছে
আর মিষ্টি কণ্ঠের গানে গানে
রঙিন স্বপ্নগুলোর কথা বলছে
ভাবছি বসে এখানেই থাকব
ফিরে যেতে মন না চাইছে
সাগর পানে চেয়ে দেখি
সন্ধ্যার এই গোধূলি লগ্ন
ধন্য আমি ধন্য
হয়েছি এই দেশে জন্ম

# মায়ের কোল

## বিলকিছ

এসো এসো, মায়ের কোল থেকে এসো
ধরো ধরো, সিদীপের হাত ধরো
চলো আমরা বর্ণমালা শিখি
সে বর্ণ দিয়ে গাঁথব মালা
গেঁথে রাখব হৃদয়ের মাঝে
ঝরতে দিবে না সিদীপ আমাদের
জাগিয়ে তুলবে বাংলার শিশু
আর কোন থাকবে না নিরক্ষর
জ্বলে উঠবে বাংলার ভাষা

# বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর জন্মদিন ও ‘অব্যক্ত’র শততম বার্ষিকী এবং নারী জগরণের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়ার জন্মবার্ষিকী পালন

২৩ ডিসেম্বর ২০২২এ ঢাকায় সিদীপের (সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস) সেমিনার কক্ষে ‘বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি’ ও ‘শিক্ষালোকে’র যৌথ আয়োজনে বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর জন্মদিন ও ‘অব্যক্ত’র শততম বার্ষিকী এবং নারীজাগরণের পথিকৃৎ রোকেয়ার জন্মবার্ষিকী ও ‘সুলতানার স্বপ্ন’ নিয়ে দিনব্যাপী আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এমেরিটাস আবুল কাসেম ফজলুল হক। জগদীশচন্দ্রকে নিয়ে আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন খ্যাতিমান সাংবাদিক সৈয়দ বদরুল আহসান এবং বেগম রোকেয়া নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষাবিদ অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম। আলোচনা করেন লেখক শাজাহান ভুঁইয়া, খান মো. রবিউল আলম, মাসুদা ফারুক বানু রত্না, সালেহা বেগম, শিশির মল্লিক ও শাহেরীন আরাফাত। জগদীশচন্দ্র ও রোকেয়ার রচনা থেকে পাঠ করেন মো. মাহবুব উল আলম ও মিঠুন দেব। দিনব্যাপী অনুষ্ঠানশেষে জুমে অংশগ্রহণ করে সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রধান সম্পাদক যুক্তরাষ্ট্র-প্রবাসী বিজ্ঞানী ও লেখক আশরাফ আহমেদ। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির সম্পাদক আলমগীর খান ও নির্বাহী সম্পাদক নাজনীন সাথী। অনুষ্ঠানের শুরুতে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির সম্পাদকমণ্ডলির সদস্য তরুণ বিজ্ঞানী আনোয়ারুল আজিম খান অঞ্জনের অকাল মৃত্যুতে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু ও বেগম রোকেয়াকে নিয়ে আলোচনায় বাঙালি জাতির ঐতিহাসিক সংগ্রামের প্রেক্ষিতে তাঁদের অবদান তুলে ধরেন এবং এ ধরনের আয়োজনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন।

*(ছবিতে ডান থেকে) অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক, অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম, সমাজকর্মী সিরাজুদ দাহার খান ও জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সৈয়দ বদরুল আহসান*

# আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন

‘ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন, জেন্ডার বৈষম্য করবে নিরসন’ প্রতিপাদ্যে বাংলাদেশেও যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয়েছে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। দিবসটিকে সামনে রেখে সিদীপ তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালা আয়োজন করেছে। ৫ মার্চ সকালে সিদীপের গ্রন্থাগার ও সভাকক্ষে ‘মুক্তকথন’ নামে একটি আলোচনার আয়োজন করা হয়, যেখানে সংস্থার নারীকর্মীগণ কর্মক্ষেত্রে তাদের নানাবিধ সমস্যার কথা তুলে ধরেন এবং সিদীপের নির্বাহী পরিচালক তা নিরসনের আশ্বাস দেন। ৬ জুন আন্তর্জাতিক নারী দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য বিষয়ে নারী সহকর্মীদের সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে মাঠপর্যায়ের নারীকর্মীদের জন্য দুটি ব্যাচে জুমে ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করা হয়।

৭ মার্চ সিদীপের মাঠ পর্যায়ে শাখা ব্যবস্থাপকগণ নারী সহকর্মীদের উদ্দেশে দিবসটির প্রতিপাদ্য এবং কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সংস্থা-নির্ধারিত পদক্ষেপ বিষয়ে আলোচনা করেন। এ ছাড়া সিদীপের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির শিক্ষাসুপারভাইজারগণ শিক্ষিকাগণকে সমবেত করে দিবসটির প্রতিপাদ্য ব্যাখ্যা করেন।

এ দিন বিকেলে সংস্থার গ্রন্থাগার ও সভাকক্ষে প্রধান কার্যালয়ের সকল কর্মীর এক সমাবেশ আয়োজন করা হয়। সিদীপের নির্বাহী পরিচালক এতে জুমে অংশ নেন। নারী দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে এ সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিদীপের পরিচালক (ফিন্যান্স অ্যান্ড ডিজিটাইজেশন) জনাব এস, এ, আহাদ। এরপর স্লাইড শো-এর মাধ্যমে নারী দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য ব্যাখ্যা করে এর তাৎপর্য তুলে ধরেন জনাব ফারহানা ইয়াসমিন (ম্যানেজার, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অ্যান্ড অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট)।

এরপর ‘সেরা কর্মী’ ও ‘জাগো নারী’ শীর্ষক দুটি নাটিকার মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে উত্যক্তকরণ ও নারীকর্মীগণকে নিগ্রহের চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়। নাটক দুটিতে অভিনয় করেন: শারমিন, তাওহীদ, মাহবুব, আরিফা, জয়, অরিস, মনজুর শামস, আলমগীর, রেজা, পীযুষ ও মোহাম্মদ আলী।

এরপর সকল নারী ও পুরুষকর্মী মিলে আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয় ও প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করা হয় যে, সর্বক্ষেত্রে নারীপুরুষ সাম্যতা সৃষ্টির জন্য সবাই একত্রে কাজ করবে।

*নাট্য উপস্থাপনার একটি দৃশ্য*

# মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের এক অসাধারণ সৃষ্টি
# ‘আলো ছায়ার খেলা’

মোহাম্মদ মাহবুব উল আলম

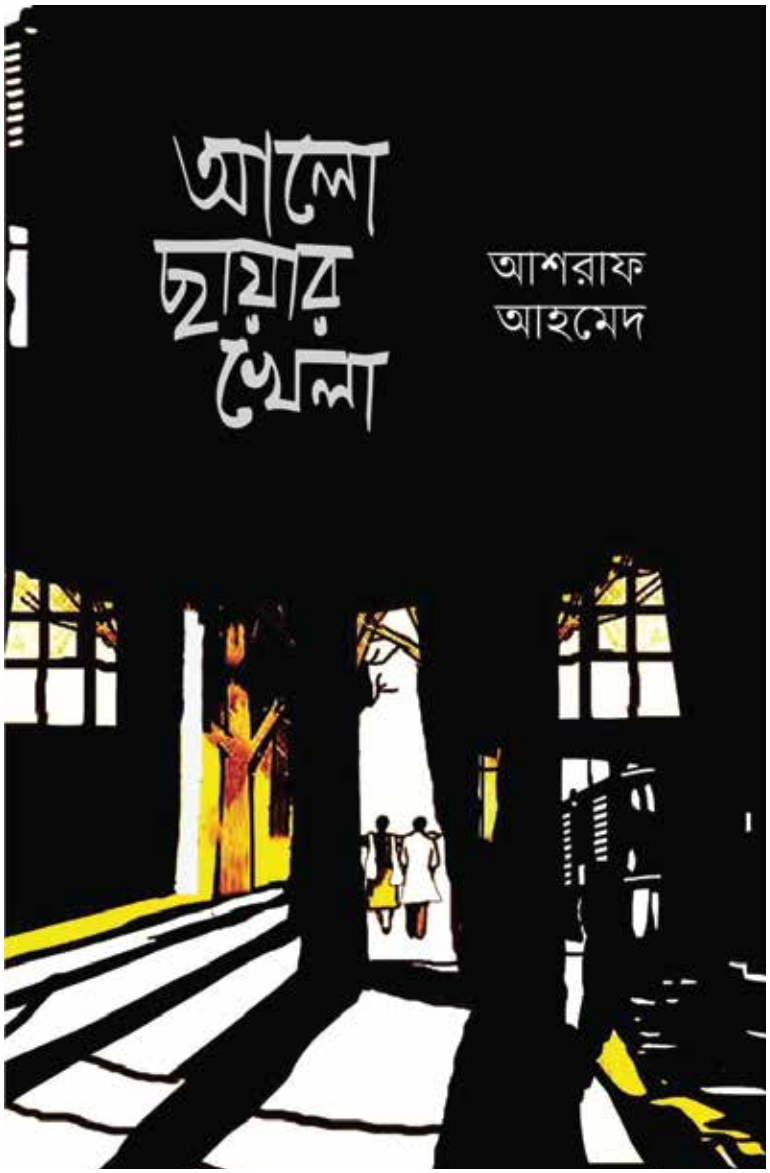


রাজুর মৃত্যু সংবাদে চোখে পানি এসেছে আবার পরক্ষণেই মনের কোণে আশা জেগেছে আবীর হয়তো মালতিকে নিজের করে পাবে, পরমুহূর্তেই আবার মালতির বিয়ের খবরে আশাভঙ্গ হলো। রাজুকে খুব কাছের কোন বন্ধুই মনে হয়েছে। পড়তে পড়তে কখন যে নিজেকে আবীর, রাজু, রিয়াজদের বন্ধু ভাবতে শুরু করেছি তা খেয়ালই করিনি

বিজ্ঞানী পরিচয় শুনলেই অনেকের চোখের সামনে একজন রসকষহীন কাঠখোট্টা মানুষের চেহারা ভেসে উঠতে পারে। মনে হতে পারে যেন সারাক্ষণ কোন নতুন কিছুর সন্ধানে ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকা একজন মানুষ যিনি কঠিন কোন সমীকরণের সমাধানে ব্যস্ত। বিজ্ঞানী আশরাফ আহমেদ এখানে ব্যতিক্রম। বিজ্ঞানী পরিচয়কে ছাপিয়ে তিনি পুরোদস্তুর সাহিত্যিক, একজন সমাজচিন্তক। সমাজকে, সমাজের মানুষকে তিনি যেভাবে পর্যবেক্ষণ করেন তা তার লেখনীতে দারুণভাবে ফুটে ওঠে। তাঁর সাম্প্রতিক উপন্যাস ‘আলো ছায়ার খেলা’।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আবীরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু রাজু, যার আবীরের সাথে

সপ্তাহের প্রায় প্রতিটি দিন কাটতো। হঠাৎ করেই সে উধাও হয়ে গেছে, কোন ধরনের যোগাযোগ নেই। দীর্ঘদিন পর একদিন সে এসে আবীরের সামনে উপস্থিত হলো। সংস্কৃতিমনা পরিবারের সবার আদরের ছোট সন্তান রাজু ঘটনাক্রমে তার সেঝভাবি মালতিকে বিয়ে করে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা সংসার পাতে। বন্ধুবান্ধব, মাবাবা ও ভাইবোনের সাথে সম্পর্কহীন একা জীবনের শূন্যতা কাটাতে রাজু পুরোনো বন্ধু আবীরের সাথে পুনরায় যোগাযোগ করে। বিয়েঘটিত কারণে শৈশবের সবচেয়ে কাছের বন্ধু রিয়াজের সাথে তার দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল। আবীরের সঙ্গেও সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন না হয় সেজন্য কৌশলে আবীরের কাছে সেঝভাবিকে বিয়ে করার ঘটনাটি লুকালেও তার প্রেমে পড়ে যাওয়ার ব্যাপারটা লুকায়নি। বরং সেটাকে উপজীব্য করে সে নতুন এক গল্প ফাঁদে এবং আবীরকে ধোঁয়াশার মধ্যে রাখে।

ফেব্রুয়ারি ২০২৩এ আগামী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত আশরাফ আহমেদের "আলো ছায়ার খেলা" উপন্যাসটি লেখকের প্রিয় বন্ধু প্রয়াত মোহাম্মদ ইয়াহিয়াকে উৎসর্গীকৃত। বইটি হাতে নিয়ে প্রথমেই চোখ আটকেছে এর প্রচ্ছদে। নির্ঝর নৈশব্দর তার আঁকা প্রচ্ছদে আলো ও ছায়ার খেলার মাধ্যমে গল্পের বিষয়বস্তুকে ধরতে চেষ্টা করেছেন। একে আপাত কোন রোমান্টিক উপন্যাস বলে মনে হলেও আদতে এটি তেমন নয়, বরং কৈশোর ও যৌবনকালের সম্পর্কের চমৎকার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এটি। কোন একটি নির্দিষ্ট গন্ডিতে একে ব্যাখ্যা করা যায় না । প্রেম-ভালোবাসার গল্প যেমন আছে তেমনি পারিবারিক সম্পর্কের টানাপড়েন বর্ণিত হয়েছে সাবলীলভাবে। রহস্যোপন্যাস না হয়েও শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত লেখক রহস্যের যে ইন্দ্রজাল বিছিয়েছেন পাঠক সেখানে নিজেকে জড়িয়ে ফেলবেন অবচেতনভাবেই। বহুদিন পর কোন বই এতো উপভোগ করেছি।

বইয়ের প্রথম কয়েক লাইন পড়েই উপলব্ধি করা যায় কতোটা শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়েছে গল্পের গাঁথুনি। প্রতিটি চরিত্রের বুনন, গল্পের ধীরলয়ে এগিয়ে চলা, মনে হয় যেন ছোট্ট শান্ত নদীটির মৃদু ঢেউয়ের খেলা যা চোখে এক অনাবিল আরাম দেয় এবং ভীষণ রকম উপভোগ্য। দীর্ঘসময় তাকিয়ে থাকতেও ক্লান্তি লাগে না। বরং মনে ভাবের সঞ্চার হয়। আচ্ছন্নের মতো স্মৃতির পাতার এলোমেলো দৃশ্যগুলো চোখের সামনে ভাসতে থাকে। মাঝেমাঝেই নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে ফিরে যাচ্ছিলাম। এখানেই লেখকের সার্থকতা। পাঠক পড়তে পড়তে এতোটাই মোহাচ্ছন্ন হবেন যে নিজেকে গল্পের অংশ ভাবতে শুরু করবেন। গল্পের পরতে পরতে লেখক এমন সাসপেন্স রেখেছেন যে একবার পড়া শুরু করলে শেষ না করে উঠা প্রায় অসম্ভব। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আবীরের চরিত্রটি দারুণ লেগেছে। কৈশোর-উত্তীর্ণ একটা ছেলের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণসহ প্রেমভালোবাসার যে দোলাচলে লেখক পাঠিকাকূলকে ভাসিয়েছেন তা অনবদ্য। মালতি ও রাজু মিলে কাল্পনিক চরিত্র তাসলিমাকে সামনে এনে আবীরকে যে রহস্যের দ্বিধাদ্বন্দ্বে আচ্ছন্ন করে রেখেছেন তা লেখক দারুণভাবে বর্ণনা করেছেন।

আবীরের পাশাপাশি পাঠক-পাঠিকাকেও রহস্যের এক মায়াজালে জড়িয়ে রেখেছেন সুনিপুণ দক্ষতায়। আবীরের মনে মালতির জন্য যে দুর্বলতা সৃষ্টি কিংবা রাজুর তার সেঝভাবির প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়া, রাজুর পরিবারের স্বাভাবিক আচরণ একটু অস্বাভাবিক লাগলেও লেখকের সৃষ্টিশীল প্রাঞ্জল বর্ণনায় তা এতোটাই নিখুঁত লেগেছে যে গল্পে হারিয়ে গিয়েছিলাম। রাজুর মৃত্যু সংবাদে চোখে পানি এসেছে আবার পরক্ষণেই মনের কোণে আশা জেগেছে আবীর হয়তো মালতিকে নিজের করে পাবে, পরমুহূর্তেই আবার মালতির বিয়ের খবরে আশাভঙ্গ হলো। রাজুকে খুব কাছের কোন বন্ধুই মনে হয়েছে। পড়তে পড়তে কখন যে নিজেকে আবীর, রাজু, রিয়াজদের বন্ধু ভাবতে শুরু করেছি তা খেয়ালই করিনি।

পুরো নাম সৈয়দ আশরাফউদ্দিন আহমেদ। জন্ম ১৯৫১ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। মূলত বিজ্ঞানী হলেও শেষ বয়সে, ২০১৩ থেকে বাংলায় লেখালিখির জগতে প্রবেশ করেন। সমাজ-সচেতন এই লেখকের বিশেষত্ব হচ্ছে সৃজনশীলতা ও হাস্যরসের মাধ্যমে জীবনকে তুলে ধরা। বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প, প্রবন্ধ, মুক্তিযুদ্ধ, উপন্যাস ও ভ্রমণকাহিনি নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে ১১টি বই। তাঁর সহজ ও সাবলীল এবং লেখার বিশেষ স্টাইলটি সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, এবং সব কটি বই-ই পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে।

জাপানে পিএইচডি ডিগ্রিপ্রাপ্ত হয়েও যুক্তরাষ্ট্র ফেডারেল সরকারের একটি গবেষণাগারের ঊর্ধ্বতন বিজ্ঞানী হিসেবে কাজ করে ২০২১ সালে অবসরে যান। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েক ফরেস্ট ইউনিভার্সিটির সাবেক শিক্ষক।

বলধা গার্ডেনের বিবরণ পড়তে পড়তে সেখানে এখনো না যাওয়ায় মনে এক আক্ষেপ তৈরি হয়েছে। পড়ার ফাঁকেই আমার স্ত্রীকে ফোন করে জানিয়েছি সে ঢাকায় আসলে তাকে বলধা গার্ডেনে বেড়াতে নিয়ে যাব। শেষ পৃষ্ঠায় যে নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে লেখক মূল ঘটনা সামনে এনেছেন তা রীতিমতো মনে ধাক্কা লেগেছে! সর্বোপরি বলা যায়, আমার পাঠকমন গভীরভাবে তৃপ্ত। এক কথায় আশরাফ আহমেদের 'আলো ছায়ার খেলা' এক অসাধারণ সৃষ্টি।

*লেখক: উন্নয়নকর্মী ও সমালোচক*

# মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারে
# সেরা পাঠক-পাঠিকা নির্বাচন ও পুরস্কার প্রদান

বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর জন্মদিন ও 'অব্যক্ত'র শততম বার্ষিকী
এবং
নারী জাগরণের পথিকৃৎ রোকেয়ার জন্মবার্ষিকী ও 'সুলতানার স্বপ্ন'
দিনব্যাপী আলোচনা, পাঠ ও সঙ্গীত
২৩ ডিসেম্বর ২০২২
সিদীপ গ্রন্থাগার ও সভাকক্ষ (৬ষ্ঠ তলা)
আয়োজক
শিক্ষালোক